তোতাপাখির পাকামি

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই আষাঢ়,
১৩৭০

প্রথম সংস্করণ, ১১০০ সংখ্যা
দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২২০০ সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩৭৩

টা. ২·৭০

প্রচ্ছদসজ্জা :
শৈল চক্রবর্ত্তী

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রক : শ্রীজীবনকুমার বসু
রূপশ্রী প্রেস (প্রাঃ) লিঃ,
৯, এণ্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

স্নেহের

মীনা, মিনতি, প্রণতি,

সুদর্শন, সুমতি আর

সুরঞ্জনকে

শিব্রামকাকা

তোতাপাখির পাকামি

হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন চিংড়িহাটা দিয়ে হাঁটছিলেন।

'আমার পক্ষে এটা যেমন চিংড়িহাটা তেমনি আবার চ্যাংড়াহাটাও।' বললেন হঠাৎ হর্ষবর্ধন।

'তার মানে?' গোবর্ধন জিগ্যেস করে।

'তুই একটা চ্যাংড়া তো। তোর মতন চ্যাংড়ার সঙ্গে হাঁটা মানেই চ্যাংড়াহাটা—তা ছাড়া আর কি!'

গোবর্ধন দাদার কথার সমুচিত জবাব দিতে চায়, কিন্তু কোনো কথা খুঁজে পায় না। চুপ করে থাকে।

'তোমার টেরিটি এবার বাগিয়ে নাও গো দাদা!' খানিক বাদে সে বলে ওঠে।

'কেন বল্ তো।'

'খদ্দের পাবে!'

'কিসের খদ্দের?'

'আমরা এবার টেরিটি বাজারে এলাম কিনা!' গোবর্ধন প্রাঞ্জল করে: 'তোমার টেরির খদ্দের পাবে এবার।'

এতক্ষণে উপযুক্ত একটা উত্তর দিতে পেরে সে মনে মনে পুলকিত হয়। দাদা কিন্তু কথাটা গায়ে মাখেন না। বলেন, 'পাখিস্থানটা কোথায় খুঁজে বার কর্ তো দেখি!'

'ম্যাপ দাও, দেখিয়ে দিচ্ছি।'

'ম্যাপ কিসের?'

'ভারতবর্ষের। ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব—দুই সীমান্তে পাকিস্তান অবস্থিত।'

'দুত্তোর অবস্থিত!' দাদা ভারি বিরক্ত হন, 'আরে, আমি কি সেই পাকিস্থানের কথা বলছি নাকি? টেরিটি বাজার হচ্ছে পাখির বাজার। সেটা কোন্‌খানে ছাখ্ না! ভালো মতন একটা পাখি কিনে নিয়ে বাড়ি যাব আজ।'

'বা-বা-বা!' পাখির কথায় গোবরা লাফিয়ে ওঠে: 'আমি পাখি ভারি ভালোবাসি দাদা! আমাকে একটা তোতাপাখি কিনে দিয়ো, তাকে আমি পড়াব।'

'ছাখ তাহলে কোথায় পাখির দোকানটা।'

দেখতে আর হল না: শোনা গেল দেখতে না দেখতেই। খানিক বাদেই পাখিদের কিচির-মিচির কানে এল ওদের। সেই পাখোয়াজি গলার অনুসরণে একটু না যেতেই পাখির বাজার দেখা দিল। খাঁচায় খাঁচায় পাখির জটল্লা। পাখিদের হল্লা।

'আমাদের একটা তোতাপাখি দাও তো।' এক দোকানীকে গিয়ে দাদা বললেন।

'কি রকম তোতা? শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, না উচ্চশিক্ষিত?' জানতে চাইল পাখিওয়ালা।

'পাখি আবার উচ্চশিক্ষিত কি রকম?' কৌতূহল হয় হর্ষবর্ধনের!

'বাংলা জানে, হিন্দী জানে, উর্দু জানে, তামিল জানে...'

'উড়ে?' গোবর্ধন জানতে চায়।

'কী যা-তা বকচিস্!' বাধা দেন দাদা: 'পাখি আবার উড়ে না তো কি? ছেড়ে দিলেই তো উড়ে যাবে।'

'না না, আমি বলছিলাম উড়িয়াদের ভাষা...'

'হ্যাঁ, তাও জানে।' জানালো দোকানী: 'এক একটা আবার ইংরিজিও জানে বেশ।'

'বলো কি হে!' হর্ষবর্ধন তো হতবাক্।—'ভালোরকম জানে নাকি? বটে? ম্যাট্রিক পাশকরা পাখি?'

'না। ইংরিজি পড়তে পারবে না। তবে বলতে-কইতে পারে।'

'না। সেই রকম সাহেব পাখি আমাদের দিয়ো না।' গোবর্ধন আপত্তি জানায়ঃ 'সাহেবদের গ্যাট-ম্যাট আমরা বুঝতে পারব না।'

'হ্যাঁ, আমরা সাদাসিধে মানুষ, আমাদের আটপৌরে বাঙালী পাখি দেবে।' দাদারও সায় ভায়ের কথায়। শুধু ভায়ের কথাই নয়, তাঁর পক্ষেও সেটা ভয়ের কথা।

'তাহলে একটু দাঁড়ান বাবু, এক্ষুনি আমাদের পাখির ডাক হবে। আর সব খদ্দের এসে পড়বে এক্ষুনি। তারা এলেই ডাক শুরু হবে। ঐ যে তোতাটা দেখছেন, দাঁড়ে বসানো, ওটা বাংলানবীশ। ওটাকেই না হয় সবার আগে নিলামে চড়াবো।'

খানিক বাদেই জনকয়েক খদ্দের জুটলো। ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগলো পাখিদের। কেউ ময়না, কেউ টিয়া, কেউ শালিক, কেউ আবার সেই তোতাটাকেই পছন্দ করল। ডাক শুরু হল পাখিগুলোর। কয়েকটা শালিক ময়না এক ডাকে বেরিয়ে গেল। তারপর তোতাপাখিটা উঠলো নিলামে।

'পাঁচ টাকা।' হাঁক দিল দোকানী।

'সাড়ে পাঁচ।' ডাকলো একজন খদ্দের।

'দশ টাকা।' গোবর্ধনের ডাক।

'বিশ টাকা।' হর্ষবর্ধন হাঁকলেন।

'বারে! আমিই তো ডাকছি। তুমি আবার আমার ওপর ডাকছো কেন?' দাদার কাণ্ডে গোবরা তো অবাক্ঃ 'দর বাড়াচ্ছো মাঝ থেকে? আমি কিনলে কি তোমার কেনা হবে না?'

'ও, তুই ডাকছিস বুঝি!' দাদা একটু অপ্রতিভ হন।

'পঁচিশ টাকা।' গোবর্ধন ডাকলো তখন।

'তুই আবার আমার ওপর ডাকলি যে! তুই আর আমি কি পৃথক?' হর্ষবর্ধন ক্ষুব্ধ হন: 'তুই যদি এমন করিস তাহলে আমিও ফের তোর ওপরে ডাকবো আবার। তা কিন্তু বলে দিচ্ছি।'

'না না, আর এমনটা হবে না আমি কথা দিচ্ছি...' গোবর্ধন বলতে যায়, এমন সময়ে আবার ডাক ওঠে—'তিরিশ টাকা।'

'কে ডাকলো আবার?' হর্ষবর্ধন বলেন।

'আমি ডাকিনি...' গোবর্ধন বলে: 'আমার ডাক চল্লিশ।'

'পঞ্চাশ।'

'আবার তুমি ডাকছো দাদা?'

'কই, আমি তো ডাকিনি! কে ডাকলো তবে?' বলে তিনি হাঁক পাড়েন: 'সত্তর। আমি ডাকছি সত্তর।'

'বাহাত্তর।' মিহি গলায় শোনা যায়।

'নিরনব্বই।' হর্ষবর্ধন ডাক ছাড়েন।

'একশো আট।' কে ডাকে কে জানে।

'তিনশো ছাব্বিশ।' হর্ষবর্ধনের রাগ চড়ে, ডাক চড়ে।

'পাঁচশো।' গোবর্ধনের ডাক নয়।

'সাতশো।' আবার কার ডাক।

'দু হাজার।' হর্ষবর্ধনের হাঁক শোনা যায়।

'বাস্, আর নয়।' দোকানদার মাঝে পড়ে বলেন: 'দু হাজার এক...দু হাজার দুই...বাস্। খতম্। দিন দু হাজার টাকা।'

কুড়িখানা একশো টাকার নোট গুণে দিয়ে পাখি নিয়ে দু' ভাই রওনা দেন। কিছুদূর এসে দাদার খটকা লাগে—'আরে, এতগুলো টাকা দিয়ে কিনলাম পাখিটা। কিন্তু পাখিটাকে তো বাজিয়ে নেওয়া হয়নি। এখন কথা বলতে জানে কিনা এটা কে জানে!'

'উজবুক !'

'তুই আমাকে উজবুক বললি ?' হর্ষবর্ধন ভারি খাপ্পা হন : 'উজবুক না উল্লুক কী বললি তুই ! ছোট ভাই হয়ে কিনা দাদাকে উল্লুক বলে !'

'আমি কোথায় বললাম ! বা রে !' গোবরা প্রতিবাদ করে।

'উজবুক কোথাকার !' পাখিটার গলা থেকে আসছে কথাটা, স্পষ্টই শোনা যায়।

'আরে, পাখিটা গাল পাড়ছে যে !'

'অবাক্ কাণ্ড !' গোবরা গালে হাত দেয়।

'আমি যদি কথা কইতে জানি না তবে এতক্ষণ কে কথা কইছিল তোমাদের সঙ্গে ?' তোতাপাখিটা বকে।

'তার মানে ?'

'নিলাম ডাকছিল কে ? নিলামের ডাক বাড়াচ্ছিল কে এতক্ষণ ?'

'মানে, তুমিই ডাক বাড়াচ্ছিলে ? বটে !' দুই ভাই বিস্ময় মানেন।

'চ ফিরে সেই পাখিওয়ালার আড়তে।' হর্ষবর্ধন বলেন : 'যে পাখিটাকে এমন করে পড়াতে পারে সে না জানি⋯'

দু' ভায়ে আবার ফিরে আসেন টেরিটিবাজারে।

'হ্যাঁ গা, তোমরা সামান্য পাখিটাকে এমন শিক্ষিত করলে কি করে ?'

'আলমবাজারে যে আমাদের পশুপক্ষীর ইস্কুল আছে বাবু !' ব্যক্ত করে আড়তদার : 'সেখানে আমরা জীবজন্তুদের শিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষ করি।'

'বেশ ভাল কথা। আমি বলছিলাম কি, তোমরা যখন জীবজন্তুদের শিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষ করো, তখন আমার এই ভাইটিকেও যদি⋯'

'আপনার ভাইকে !'

'হ্যাঁ, আমার ভাইও একটা জন্তু তো!...জন্তু ছাড়া কিছু নয়।'

'আমি জন্তু!' গোবর্ধন ফোঁস করে ওঠে।

'তা জন্তু ঠিক না হলেও জানোয়ার তো বটেই! এমন জান বার করে দেয় আমার এক এক সময়। মানুষ হল না ছোঁড়াটা। একে আমি তোমাদের ইস্কুলে ভর্তি করে দিতে চাই।'

'খাঁটি জানোয়ার নিয়ে আমাদের কারবার মশাই! সেখানে এসব ভ্যাজাল চলে না। আসল জীবজন্তু নিয়ে আসুন, মানুষ করে ছেড়ে দেব।'

'আপনারা কী শেখান? শুনি?'

'ইংরেজি, বাংলা, হিন্দী, অঙ্ক, জিমন্যাস্টিক, ড্রিল, প্যারেড, সব। সার্কাসের বাঘ-ভাল্লুক-সিংহ-হাতী—এদের শেখায় কারা? আমরাই তো।'

'আচ্ছা, সেই ভালো।' হর্ষবর্ধন বলেন তখন: 'গোবরাটার যখন ইচ্ছে নয়, মানুষ হতে চাইছে না যখন, আর আপনারাও যখন নারাজ, তখন ওর বদলে ওর কুকুরটাকেও ভর্তি করব আপনাদের ইস্কুলে। দেখা যাক্ সেটা যদি আপনাদের কৃপায় শিক্ষিত হয়। তারপর তার দেখাদেখি আমার ভাইও যদি...' তার বেশি আর তিনি ব্যক্ত করেন না। 'এগজাম্পল ইজ বেটার দ্যান অ্যাডভাইস।' এই বলে শেষ করেন।

শেষটা গোবর্ধনের বুলডগটাকেই আলমবাজারের পশুপক্ষীর পাঠশালায় ভর্তি করে দেওয়া হল। রীতিমতন আবাসিক বিদ্যালয়। পশুপক্ষীরা হোস্টেলে থাকে, ইস্কুলে পড়ে। গরমের আর পূজোর ছুটিতে বাড়ি আসে। সব ইস্কুলের যেমন রেওয়াজ।

গরমের ছুটিতে বাড়ি ফিরল বুলডগ। দুই ভাই তাকে নিয়ে পড়লেন—কদ্দূর শিখেছে দেখা যাক্।

'অঙ্ক পারিস—অঙ্ক ? তুই আর তুয়ে কত হয় ?'

'ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্।' কুকুরটা পা ঠুকে জানালো—চার।

'বাঃ, অঙ্কটা তো বেশ শিখেছে দেখছি! নামতা জানিস, নামতা? ষোলো ষোলো কতো হয় বলতে পারিস?' গোবর্ধন শুধোয়।

কুকুরটা আর পা নাড়ে না, চুপ করে থাকে।

'একেবারে ষোলো ষোলোং!' হর্ষবর্ধন বিরক্ত হন: 'কেউ তা পারে? তুই পারিস বলতে—ষোলো ষোলোং? আমি পারি? কেউ পারে, যে ও পারবে?'

'আচ্ছা থাক। জিমন্যাস্টিক শিখেছিস্? ড্রিল? প্যারেড? লেফট···রাইট··লেফট·· রাইট·· '

কুকুরটা লেজ নাড়ে কেবল।

'ওই তো শিখেছে। লেজের ড্রিলটাই শিখেছে দেখছি। ডাইনে বাঁয়ে নাড়ছে তো। বেশ নাড়ছে। ক্রমে ক্রমে শিখবে সব। ক'দিন আর পড়েছে বল্।'

'সমস্কৃত শিখেচিস?' গোবর্ধন শুধায়।

কুকুর চুপ।

'হাঁ কি না বল্। শিখেচিস সমস্কৃত?'

কুকুর নিরুত্তর।

'ওমা! মাঝখান থেকে এযে দেখছি তামিলটাও ভুলে গেল আবার?'

'কিসের তামিল?' জানতে চান দাদা।

'হুকুম তামিল।' বলল গোবর্ধন: 'কথার কোনো জবাবই দিচ্ছে না দেখছ!'

'কি করে শিখবে সমস্কৃত? কুকুররা কি অনুস্বর উচ্চারণ করতে পারে? অং বং বলতে পারবে কুকুর? তোর যত বাড়াবাড়ি!'

'তাহলে জাতীয় ভাষা ? হিন্দী ?' গোবরার জিজ্ঞাসা।

কুকুরটা চুপ।

'বিজাতীয় ভাষা ? তাও কিছু শিখিসনি ? ইংরিজি, ফরাসী, গ্রীক, ল্যাটিন···?' হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসু।

'ম্যাও !' কুকুরটা মুখ খোলে এবার।···

'হাড়ে হাড়ে শিক্ষা পেয়েছে দেখছি।' তোতাপাখিটা দাঁড়ে বসে পাকামি করে। ফোড়ন কাটে।

'মিউ !' করুণ সুরে কুকুরটা সাড়া দেয়।

ছারপোকার বাড়

ছারপোকা আমি মারি নে। মারতে পারি নে। মারতে মারতে হাতব্যথা হয়ে যায় কিন্তু মেরে ওদের শেষ করা যায় না।

তাছাড়া, মারলে এমন গন্ধ ছাড়ে! বিচ্ছিরি! শহীদ হয়ে ওরা কীর্তির সৌরভ ছড়ায় এমন—আমার কীর্তি আর ওদের সৌরভ—যাতে আমাদের উভয় পক্ষকেই ঘায়েল হতে হয়।

প্রাণ দিয়ে ওরা আমাদের নাক মলে দিয়ে যায়। যা নাকি কানমলার চেয়েও খারাপ।

এই কারণেই আমি ছারপোকা কখনো মারি নে।

আমার হচ্ছে সহাবস্থান। ছারপোকাদের নিয়ে আমি ঘর করি। আত্মীয়স্বজনের মতোই একসঙ্গে বাস করি তাদের নিয়ে।

আমার বিছানায় হাজার-হাজার ছারপোকা। লাখ-লাখও হতে পারে। এমন কি কোটি-কোটি হলেও আমি কিছু অবাক্ হব না।

কিন্তু তারা আমায় কিছু বলে না।

আমিও তাদের মারি নে, তারাও আমায় কামড়ায় না। অহিংস-নীতির, গান্ধীবাদের উজ্জ্বল আবাদ আমার বিছানায়।

আমি করেছি কি, একটা কম্বল বিছিয়ে দিয়েছি আমার বিছানায়। কম্বলের ঝুল চৌকির আধখানা পায়া অবধি গড়িয়েছে।

চৌকির ফাঁকে-ফোকরে তো ওদের অবস্থান। আমার গায়ে এসে পড়তে হলে তাদের কম্বলের এবড়োখেবড়ো পথ ভেঙে আসতে হবে। আসতে হবে পশমের জঙ্গল ভেদ করে।

কিন্তু সেই উপশমের উপর নির্ভর না করেও আমি আর-একটা কৌশল করেছি। চৌকির চারদিকে কম্বলের ঝুল-বরাবর ফিনাইলের

এক পোঁচ লাগিয়ে দিয়েছি। রোজ রাত্রেই শোবার আগে নিপুণ তুলির দক্ষতায় একবার করে লাগাই। তাই দিয়ে কম্বলের তলার দিকটা কেমন চটচটে হয়ে গেছে। হোক গে, তাতে আমার চটবার কোন কারণ নেই। ফিনাইলের গন্ধ, আমার ধারণা, মানুষের গায়ের গন্ধের চেয়ে জোরালো। সেই গন্ধের আড়ালে আমি গায়েব। আমার গন্ধ তারা পায় না। চৌকির উপরেই যে আমি তা তাঁরা টের পায় না।

তাদের মধ্যে যারা ভাস্কো-ডি-গামা কি কলম্বাস গোছের, তারা হয়তো চৌকির তলার থেকে বেরোয়—আমার আবিষ্কার উদ্দেশে। কিন্তু ফিনাইলের বেড়া অবধি এসে ঠেকে যায় নির্ঘাত, এগুতে পারে না আর। তাদের নাকে লাগে, তারপর আরও এগুলে পায়ে লাগে, ফিনাইলের কাদায় তাদের পা এঁটে বসে যায়, চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত চটচটে কম্বলের সঙ্গে তাদের চটাচটি হয়ে যায় নিশ্চয়। বিশ্বসংসারের উপর বীতশ্রদ্ধ তিতবিরক্ত হয়ে তারা ঐখানেই জবড়জং হয়ে পড়ে থাকে।

বছরের পর বছর আমার রক্ত না খেয়ে কী করে যে তারা বেঁচে আছে তাই আমার কাছে এক বিস্ময়। সেই রহস্যের আমি কিনারা পাইনি এখনও। যাকে উপোসী ছারপোকা বলে, আমার মনে হয়, সেই রকম কিছু একটা হয়ে রয়েছে তারা।

তা থাক, তারা সুখে থাক, বেঁচে থাক। তাদের আমি ভালোবাসি। তারাই আমাকে একবার যা বাঁচিয়ে দিয়েছিল—

সকালে সবে ক্ষুর নিয়ে বসেছি, আমার বন্ধু বদ্যিনাথ হন্তদন্ত হয়ে হাজির।

'পালাও পালাও, করছ কী।' বলতে বলতে আসে।

'পালাব কেন? দাড়ি কামাচ্ছি যে।'

'আরে হরেকেষ্টদা আসছে। এসে উঠবে এখানে—এই তোমার বাসায়।' সে জানায়, 'এখানেই আস্তানা গাড়বে।'

'সস্তা না।' দাড়ি কামাতে কামাতে বলি, 'সস্তা নয় অত।'

'গতবারে যখন কলকাতায় এসেছিল, উঠেছিল আমার ওখানে। যাবার সময় বলে গেছে 'আবার এলে তোর বাসাতেই উঠব, আর তোকে যদি বাসায় না পাই তো উঠব গিয়ে শিবুর কাছে'···। বলে সে একটু দম নেয়। তারপরে ইঞ্জিনের মতো হাঁফ ছাড়ে একখানা।

'আজ সকালে আমার এক টি-টি-আই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছলাম শেয়ালদায়। ইস্টিশানের প্লাটফর্মে পা দিয়েছি, দেখি কিনা, হরেকেষ্টদা ব্যাগ হাতে নামছে ট্রেন থেকে।'

'বটে?'

'দেখেই আমি পালিয়ে এসেছি···'

'যাতে হরেকেষ্টদা বাসায় গিয়ে তোমায় না পায়?'

'হ্যাঁ। চলে এলাম তোমার কাছেই। দিতে এলাম খবরটা। আমাকে যদি না পায় তো সটান তোমার এখানেই সে···।'

'আরে, আমার এখানে উঠবে কেন সে?' আমি তাকে আশ্বস্ত করি, 'একখানা মাত্র ছোট্ট চৌকি আমার, দেখছ তো, এর মধ্যে আমার সঙ্গে গুঁতোগুঁতি করতে যাবে কেন? তার কিসের অভাব? দুশো বিঘে তার ধানের জমি, দশটা আমবাগান, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা—সে কলকাতার যে-কোনো নামকরা ভালো হোটেলে উঠতে পারে।'

'এক নম্বরের কঞ্জুস। গতবারে আমার মেসে উঠেছিল, গেস্টচার্জ দিয়ে ফতুর হয়ে গেছি। তিনটি মাস নড়বার নামটি ছিল না। যাবার সময় সর্বস্বান্ত করে গেল আমায়।'

'কী রকম?'

'আমার শখের জিনিসগুলি নিয়ে গেল সব। ড্রেসিং টেবিলটা নিল, ডেক চেয়ারটাও ; ব্র্যাকেট, তার ওপরে অ্যালার্ম টাইমপিস্‌টা অবধি। বললে খাসা হবে, এসব জিনিস পাড়াগাঁয়ের লোক চোখে দেখে নি এখনো ! শেষটায় আমার টুথব্রাশটা ধরে টানাটানি।'

'সে কী ! একজনের বুরুশ কি আরেকজন ব্যাভার করে নাকি ?'

'বললে, জুতোয় কালি দেওয়া যাবে এই দিয়ে। এমন কি, আলমারিটা ধরেও টানছিল বইপত্র-সমেত। কিন্তু বড্ড ভারী বলে পেরে উঠল না। বলেছে পরের খেপে এসে মুটের সাহায্যে নিয়ে যাবে...'

'মোটের ওপর আলমারিটা তোমার বেঁচে গেছে। মুটের ওপর চাপে নি।'

'আমি পালাই। এখুনি হরেকেষ্টদা ব্যাগ হাতে এসে পড়বে হয়তো।' সে ব্যগ্র হয়ে ওঠে।

'বাড়ি যাবে এক্ষুনি ? বোসো, চা খাও।'

'বাড়ি ? আজ সারাদিন নয়। খুব গভীর রাত্রে ফিরব বাসায়। আমি ভাই এখন যাই।'

'হরেকেষ্টদার ভয়ে বাসাতেই ফিরবে না আজ ? সারাদিন থাকবে কোথায় শুনি ?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'হরেকেষ্ট হরেকেষ্ট কেষ্ট কেষ্ট হরে হরে—করে ঘুরে বেড়াব রাস্তায় রাস্তায়।' বলে সে আর দাঁড়ায় না।

দাড়ি কামিয়ে মুখ ধুতে-না-ধুতে হরেকেষ্টদা হাজির।

'আসুন আসুন হরেকেষ্টদা ! আস্তাজ্ঞে হোক।' আমি অভ্যর্থনা করি, 'আমার কী ভাগ্যি যে আজ আপনার পায়ের ধুলো পড়ল।'

'বদ্যিনাথকে বাসায় পেলাম না, তাই তোর কাছেই চলে এলাম।' ব্যাগ নামিয়ে তিনি বললেন।

'আসবেন বইকি। হাজারবার আসবেন। আপনি হলেন হরেকেষ্টদা। আমাদের গাঁয়ের মাথা। আমরা কি আপনার পর ?'

'তা নয়। তবে বদ্যিনাথ ছেলেটি ভালো। তার ওখানেই উঠি। আমাকে পেলে সে ভারী খুশী হয়।'

'আমিই কি অখুশী ? বসুন, চা খান। চা আনাই, জিলিপি শিঙাড়া কচুরি—কী খাবেন বলুন।'

'যা ইচ্ছে আন। চা-টা খেয়ে চান করে দুটি ভাত খেয়ে বেরুব একটু। কলকেতায় এসেছি, এবার তোর এখানেই থাকব ভাবছি। বদ্যিনাথকে পেলুম না যখন…'

'তা, থাকুন না যদ্দিন খুশি। দাঁড়ান, চা-টা আনাই, পোর্টম্যানটো খুলে পয়সা বার করি। ওমা, এ কী, বাক্সর চাবি কোথায় ? খুঁজে পাচ্ছি না তো। চাবিটা ফেললুম কোথায়! ভাঙতে হবে দেখছি বাক্সটা। চাবিওলা কোথায় পাই এখন ? ভাঙতে হবে দেখছি।'

'না না, ভাঙবি কেন বাক্সটা ? দুবেলা চাবিওলা হেঁকে যায় রাস্তায়। চাবি করিয়ে নিলেই হবে। বেশ পোর্টম্যানটোটি তোর। ভাঙবি কেন ? আমায় দিয়ে দিস্ বরং। দেশে নিয়ে যাব।'

শুনে আমি হাঁ হয়ে যাই। নিজের চাবি নিজেই সরিয়ে ভালো করলাম কিনা খতিয়ে দেখি।

'এখন ক টাকার দরকার তোর বল্ না ? দিচ্ছি না-হয়।'

'গোটা পাঁচেক দাও তাহলে।'

'পাঁচ টাকা ?' ব্যাগ খুলে তিনি বলেন, 'পাঁচ টাকা তো নেই রে, দশ টাকার নোট আছে।'

'তাই দাও তাহলে। পরে বাক্স খুলে দেব'খন তোমায়।'

হরেকেষ্টদার পয়সায় চা কচুরি শিঙাড়া জিলিপি জিবেগজা রাজভোগ দরবেশ বসানো যায় বেশ মজা করে।

দুপুরের আহার সেরে হরেকেষ্টদা বললেন, 'যাই, এবার একটু বদ্যিনাথের বাসা থেকে ঘুরে আসি। সে আমাকে একটা আলমারি দেবে বলেছিল। আধুনিক ডিজাইনের আলমারিটা। দেখতে খাসা। তার ওপরে রবিঠাকুরের বই ঠাসা। আমাকে উপহার দিতে চেয়েছিল বদ্যিনাথ। মুটের মাথায় চাপিয়ে নিয়ে আসি গে।'

সেই যে বেরিয়ে গেলেন হরেকেষ্টদা, ফিরলেন সেই রাত দশটায়।

হায় হায় করতে করতে এলেন—'কোথায় গেছে বদ্যিনাথটা, সারাদিন দেখা নেই। বাসার লোক বলল সকালে বেরিয়েছে, কিন্তু এই রাত সাড়ে-দশটা অবধি অপেক্ষা করে…করে·· করে…'

'এতক্ষণ বদ্যিনাথের বাসাতেই ছিলেন তাহলে?'

'না, বাসায় থাকব কোথায়? ওর ঘরে তো চাবি বন্ধ। কার ঘরে থাকতে দেবে? বাসার সামনের একটা চায়ের দোকানে বসে বসে এতক্ষণ কাটালাম।…'

'সেই দুপুরবেলার থেকে এতক্ষণ!'

'শুধু শুধু কি বসতে দেয়? বসে বসে চা খেতে হল। তিনশো কাপ চা খেয়েছি। এনতার খেলাম। খান পঞ্চাশেক টোস্ট। আড়াই ডজন অমলেট। সব বদ্যিনাথের অ্যাকাউন্টে। খেয়েছি আর নজর রেখেছি বাসার দরজায়, কখন সে ফেরে। কিন্তু নাঃ, এতক্ষণেও ফিরল না।…'

'তাহলে আর কী করবেন। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুন এবার।'

'না। কিছু খাব না। যা খেয়েছি তাতেই অম্বল হয়ে গেছে। তিনশো কাপ চা…বাপ্…জীবনে কখনো খাই নি।…না, কিছু আর খাব না। শুয়ে পড়ব সটান। মেজেয় আমার বিছানা করে দে। আছে তোর বাড়তি বিছানা? আমি তো বেডিং-ফেডিং কিছু আনি

নি। বস্তিনাথের বাসায় উঠব ঠিক ছিল। এই মেজেয়…এইখেনেয়… মাছুর-টাছুর যা হোক কিছু পেতে দে না হয়।'

'তুমি মেজেয় শোবে? তুমি বলছ কী হরেকেষ্টদা? অমন কথা মুখে এনো না, পাপ হবে আমার। তুমি আমার চৌকিতেই শোবে। আমি ঐ কম্বলটা বিছিয়ে শোব'খন মেজেয়…'

বলে আমি ফিনাইল-লাঞ্ছিত কম্বলটা বিছানার থেকে তুলে নিয়ে মাটিতে বিছোই। আর চৌকিতে তোশকের ওপর ধবধবে চাদর পেড়ে হরেকেষ্টদার জন্যে পরিপাটি বিছানা করে দিই।

হরেকেষ্টদা শুয়ে পড়েন। আমিও আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ি।

শুতে না-শুতে হরেকেষ্টদার নাক ডাকতে থাকে।

রাত বোধ হয় বারোটা হবে তখন, দারুণ একটা চটপটে আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে যায়।

কী ব্যাপার? হরেকেষ্টদার নাক আর ডাকছে না! খালি মাঝে মাঝে চটাস্ চট্ চটাস্ চট্…চটাপট চটাপট চটাপট চটাপট… শুনতে পাচ্ছি কেবল।

'ওরে, ওরে শিবু! আলোটা জ্বাল্ তো।'

'আলো জ্বালা যাবে না হরেকেষ্টদা। এগারোটার পর মেন স্যুইচ অফ করে দেয়।'

'কী কামড়াচ্ছে রে? ভয়ঙ্কর কামড়াচ্ছে। দেশলাই আছে তোর?'

'দেশলাই কোথায় পাব দাদা? আমি কি সিগ্রেট খাই?'

'তাহলে মোমবাতি?'

'বাজারে।'

'কী সর্বনাশ! টর্চ আছে? টর্চ?'

'রাত দুপুরে কেন এই টর্চার করছেন হরেকেষ্টদা? চুপচাপ ঘুমোন!'

'ঘুমোব কী রে? জ্বালিয়ে খাচ্ছে যে! বাঁ পাশটা যে জ্বলে গেল রে···বাঁ পাশে শুয়েছিলাম···পা থেকে ঘাড় পর্যন্ত জ্বলছে।···'

'পাশ ফিরে শোন।'

'পাশ ফিরে শোব কী রে? শুতে কি দিচ্ছে? উঠে বসেছি। বসতেও দিচ্ছে না। ভীষণ কামড়াচ্ছে। কী কামড়াচ্ছে রে?'

'কে জানে!' আমি নিস্পৃহ কণ্ঠে বলি: 'কী আবার কামড়াবে?'

'এ তো দেখছি খুন করে ফেলবে আমায়। একদম তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না। কী পুষেছিস তুই, তুই জানিস। ছারপোকা নয় তো রে?'

'ছারপোকা? অসম্ভব। আমি অ্যাদ্দিন ধরে শুচ্ছি, আমি কি তাহলে আর টের পেতুম না।'

'তুই একটা কুম্ভকর্ণ। নাঃ, বিছানায় কাজ নেই আমার। আমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই।'

তিনি বিছানা ছেড়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকলেন ঠায়।

সকালে আমরা উঠে দেখি···আমি উঠে দেখলাম, তিনি তো আগের থেকেই উঠেছিলেন, তিনি শুধু দেখলেন কেবল—চৌকির ওপর হাজার হাজার মৃতদেহ। ছারপোকার। হরেকেষ্টদার চাপে আর চটাপট চাপড়ে ছারপোকাদের ধ্বংসাবশেষ।

'ইস, তুই এখানে থাকিস কী করে রে? এই বিছানায় ঘুমোস কী করে? তুই একটা রাসকেল। রাবিশ—কুম্ভকর্ণ। নাঃ, আর আমি এখানে নেই। মা কালীর দিব্যি, আর কখনো এখানে আসছি না বাবা! আমার নাকে খত। বদ্যিনাথের বাসাতেই আমি থাকব। সেখানেই চললাম। সকাল সকাল গিয়ে পাকড়াই তাকে।' বলেই তিনি আর দাঁড়ালেন না। ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়লেন, তাঁর ধার দেওয়া দশ টাকার উদ্ধারের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে।

ঘড়ির চোট ঘাড়ে

নাঃ, এ ঘড়িকে নিয়ে আর চলে না! ঘড়ি-ঘড়ি এ টাইম পালটায়, একটা নতুন ঘড়ি না কিনলেই নয় আর। একটা ঘড়ি কিনেছিলাম আটাশ বছর আগে। আটাশ টাকা দিয়ে। লম্বাটে চৌকো হাত-ঘড়ি। সেই আটাশে ঘড়িটাই এখনো আমার কব্জিতে শোভা পাচ্ছে।

এ ধরনের ঘড়ির দেখা মেলে না এখনকার দিনে। আজকাল ঘড়ির এ ফ্যাশান নয়। গোলাকার হাত-ঘড়ির মরশুম এখন।

কিন্তু বাইরে গোল না দেখালেও আমার ঘড়ির ভেতরে গোল কিছু কম ছিল না। নিজের খেয়ালমাফিক চাল-চলন ওর। কখনো ঠিক ঠিক যাবে না, স্লো না হয় ফাস্ট্ হবেই। সর্বদাই তাই।

ঘণ্টায় ঘণ্টায় মিলোতে হয় এটাকে। এই আমার একটা বাড়তি কাজ। নিজেরই তাল রাখতে পারি না, তার ওপরে ঘড়ির তাল সামলাতে হচ্ছে। মনে হচ্ছে এটা আমার চাল পেয়েছে।

লক্ষ্য করেছি আবহাওয়ার প্রভাব রয়েছে এর ওপর। বাইরে ঠাণ্ডা পড়লে আমি যেমন নড়তে পারি না, এটারও তখন দেখি মন্থর গতি। ঘণ্টায় আটাশ মিনিট করে স্লো। আমার ঢিমে চাল হলে এটাও ঢিমিয়ে চলে।

আবার বাইরে গরম পড়লে আমি যখন ছটফট করছি আমার ঘড়িটাও তখন ছটফটে। তখন এটাও বেশ চটপট চলে। ঘণ্টায় আটাশ মিনিট করে ফাস্ট্।

কিন্তু এমন করে ত চলে না। সেদিন এক বিয়ের নেমন্তন্নে গেছি···কাঁটায় কাঁটায় আটটায় গিয়ে পৌঁছবার কথা! তা, আমি

হাতে আধঘণ্টা সময় রেখে সাড়ে সাতটায় রওনা হয়েছি···যেতে লাগবে পনের মিনিট পায়ে হেঁটে গেলেও·· ফাস্ট্ ব্যাচেই খাওয়া সেরে···পেটটি ভরে নিয়ে পিট্টান দেব·· ওমা, গিয়ে দেখি সেখানকার দেয়াল-ঘড়িতে তখন রাত সাড়ে-নটা! থার্ড ব্যাচ খেতে বসে গেছে ততক্ষণ···ব্যাচের পর ব্যাচ নিমন্ত্রিতরা আসতে লেগেছে শেষ চোটে··· ভিড়ে ভিড়াক্কার···তাদের সবার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাতে বসতে সাতের ব্যাচে গিয়ে পড়লাম। বারোটা বাজিয়ে ফিরলাম বাড়ি।

সবচেয়ে খারাপ কথা, সাত নম্বর ব্যাচে খাবার মতন কিছুই ছিল না। সাতের প্যাঁচে পড়ে পাতে পেলাম খান দুই লুচি, দু'চামচ পোলাও, আধখানা আলুর দম, নো ফিশফ্রাই, নো কাটলেট, এক টুকরো মাছ, তিন টুকরো মাংস (তার দুটোই হাড় আবার—আহার করব কি!) দইয়ের একটু তলানি, বোঁদের কয়েকটি পরমাণু, নো সন্দেশ, নো রসগোল্লা, নো রাবড়ি, আধখানা পাঁপরভাজা আর··· আর প্রচুর ছ্যাঁচড়া। (তিনবার চারবার করে ঐটে দিল।) ঘড়িটার ছ্যাঁচড়ামির জন্যই এমনটা হল। গোটা ভোজটাই ভোজবাজি হয়ে গেল! সারারাত ঘুম হল না আমার। মনটা খচখচ করতে লাগল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেগে কাটালাম। ঘড়িটার দিকে না তাকিয়ে।

পরদিন সকালে উঠে টেরিটি না বাগিয়েই ছুটলাম টেরিটি বাজারে। যে-কোন এক ঘড়ির দোকানে। কাঁটায় কাঁটায় ঠিক ঠিক টাইম দেয় এমনি একটা ঘড়ি কিনব। এর পর থেকে ঘড়ি ধরে হবে আমার কাজ—ভাবতেই গায় কাঁটা দিল আমার! এর পর থেকে সজারুর মতই আমি কাঁটায় কাঁটায় চলব সোজা!

ঢুকলাম দোকানে।

ঢুকতেই ধাক্কা খেলাম গোড়ায়। না, গোড়ালিতে হোঁচট খাওয়া নয়, চোটটা এল দোকানের ঘড়ির থেকে। দেখলাম, সেখানকার

প্রত্যেকটা ঘড়ি নিজের নিজের চালে চলছে। কারো একটা বেজেছে ত কেউ বাজিয়েছে আড়াইটা, কোথাও বা দশটা বেজে কুড়ি মিনিট। এমনি নানা ঘড়ির নানান বোলচাল।

ভাবলাম, ওমা, এই কিনা আবার ঘড়ির দোকান! এমনি দোকানে আমি ঘড়ি কিনতে এসেছি! এক ঘড়ির সঙ্গে আরেক ঘড়ির চাল-চলনে যার মিল নেই, সেখান থেকে চালু ঘড়ি কিনব আমি! তাহলেই হয়েছে।

রহস্যটা কী, দোকানীকে জিজ্ঞেস করতে তিনি জানালেন, ঘড়িগুলো এখন সব নিজের তালে চলছে কিনা। কেউ কিনলে পরে তখন মিলিয়ে ঠিক করে দেয়া হবে; তারপর থেকে ঠিক ঠিক সময় দেবে সবাই। দিতে বাধ্য।

শুনে একটু আশ্বস্ত হলাম। একটা দেয়ালঘড়ির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললাম—ওটার দাম কত? ঐ ক্লকটার?

আমার দরকার ছোট্ট একটা হাত-ঘড়ির—রিস্ট্ওয়াচের। কিন্তু বড়র থেকে দরদস্তুর শুরু করলে তবে আর ঠকতে হয় না। ছোটর দরের আঁচ পাওয়া যায়। তাই দেয়াল ধরেই এগুলাম আমি।

'ওর দাম দেড়শ টাকা।' জানা গেল।

'আর তার পাশের ঐ টাইমপিসটির? অপেক্ষাকৃত বেঁটে সাইজের ঐটে?' বড়র থেকে মেজর দিকে আমার নজর।

'দুশো টাকার বেশি নয়।'

'ও বাবা! ওর দাম আরো বেশি যে? আর তার পাশের ঐ খুদে টাইমপিসটার?'

'ওটারও খুব বেশি নয়। কোয়ালিটির তুলনায় দাম খুব কমই। আড়াইশো টাকার মধ্যে।'

'বাব্বা! না, আমার টাইমপিস চাইনে। ও নিয়ে কি করব?

গলায় বাঁধব নাকি! আমাকে একটা রিস্ট্‌ওয়াচ দিন। আজ-কালকার ফ্যাশানের।'

তিনি একটা পেল্লাই সাইজের গোলাকার হাতঘড়ি আমাকে দেখালেন। চ্যাপটা, পাতলা, চকচকে।—'এটা আপনার পছন্দ?'

'হ্যাঁ, খুব। দাম কতো এটার?' শুধালাম আমি।

'তিনশো পঁচাত্তর।'

'বলেন কি! না মশাই, অতো বড়ো আমার চাইনে। বড় সাইজের বেশি দাম। আপনি আমাকে ওর চেয়ে ছোট সাইজের একটা দিন।'

দিলেন তিনি। কিন্তু তার দাম চারশো পঞ্চাশ।

'মানে, চারশো টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা বলছেন আপনি?' আমি জিজ্ঞাসু।

'না মশাই, সাড়ে চারশো টাকা ওর দাম।'

'আরে সাবাস! এইটুকুন ঘড়ির দাম কিনা সাড়ে চারশো! কী সর্বনাশ! ছোট সাইজের কম দামের ঘড়ি হয় না? যেমন এইটে—'

পছন্দসই একটা দেখালাম।

'এটারও প্রায় ঐ দাম। পাঁচশো পঁচাত্তর। পঁচাত্তর নয়া পয়সা নয়, টাকা।'

'আর এইটে? ওর চেয়েও ছোট এইটের?'

'এটা মোটমাট ছ'শো।'

'কিন্তু মশাই এটা আরো ছোট তো।'

'হোক না! লেডিজ ওয়াচ যে।'

'তাই বলুন! তা মেয়েদের ঘড়ি নিয়ে আমি কি করব! আমার মনের মত হলেও আমার হাতে এটা কতক্ষণ থাকবে? আমার বোনের হাতে চলে যাবে। বেহাত হয়ে যাবে দেখতে না দেখতে।'

রামের মত আমারও প্রায় বনবাস। রামকে অনেক নদ-নদী পেরিয়ে বনে যেতে হয়েছিল, আর আমার ঘরের মধ্যেই বোন। বিনির খপ্পর থেকে এ ঘড়ি বাঁচাতে পারব না। অন্যত্র আমি বন্য হতে পারি—আমার বিক্রম চলে, কিন্তু আমার বোনের কাছে আমি নগণ্য। বিনির সঙ্গে গায়ের জোরে আমি পারি না।

'না। লেডিজ ওয়াচ আমার চাইনে। আমাকে সস্তা দামের একটা আমপাড়া ঘড়ি দিন।'

'আমপাড়া ঘড়ি! সে আবার কী মশাই?' দোকানী ত তাজ্জব।

'ছিল আমার একটা। আমার কব্জির এই ঘড়িটার আগে। বুক-পকেটে রাখা ঘড়ি এখনকার ফ্যাশান নয় জানি, কিন্তু কি করব, সময় ত রাখতে হবে। আর সস্তায় রাখতে হবে সময়। আমার সময় তত বহুমূল্য নয়।'

'কিন্তু আমপাড়া ঘড়ি··আমপাড়া ঘড়ি···নামও ত শুনিনি আমরা··!'

'যেমন সস্তা তেমনি মজবুত ঘড়ি মশাই! আপনি গোড়ায় যে বড় সাইজের গোলাকার ঘড়ি দেখালেন না? অত বড়ই গোল কিন্তু অমন চ্যাপটা নয়, পাতলা নয় অমন। বেশ মোটাসোটা হৃষ্টপুষ্ট ঘড়ি। সময়ও দেখা যায়, আবার দরকার হলে তাই ছুঁড়ে গাছের ডাল থেকে আম পেড়েও আনা যায় আবার। ঘড়ি একটুও টস্‌কায় না। চোট খায় না একটুও। আম পেড়ে মাটিতে নেমে এলেও একদম ভাঙে না, একটুও ক্ষতি হয় না ঘড়ির। বাজে ঘড়ি নয় মশাই, বেশ কাজের ঘড়ি।'

'এখন সেসব ঘড়ি পাওয়া যায় না। ব্রিটিশ আমলে ছিল। এখন কোথায় পাব আমরা?'

'সেসব ঘড়ি ছিল বিশ্বকর্মার তৈরি। এখনকার আপনাদে ঘড়ির

ত একটুতেই বেচাল, বছরে বছরে তাকে তেল দাও, অয়েলিং করো। বাইরের আবহাওয়া পালটালো কি উনিও ওলটালেন—তুনিয়ার হালের সঙ্গে ঘড়ি-ঘড়ি নিজের চাল বদলাচ্ছেন—এসব কি ঘড়ি ?'

'কি করব, এই আমাদের আছে···'

'আছে ত বলছেন, কিন্তু আছে কোথায় ? কাঁঠাল গাছে। এত উঁচুতে, যে গালে দেব কি, নাগালেই আসে না! এমন সব দর যে ছুঁতেও ভয় করে। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল দেয়াই সার। আহা, আমার সেই সাড়ে ছ-টাকা দামের আমপাড়া ঘড়ি দিয়ে অন্ততঃ সাড়ে ছ'শো আম পেড়ে খেয়েছি···' ভাবতেই আমার জিভে জল এলো।—'একদিনের জন্যও একটুও খারাপ হয়নি ঘড়িটা। কে যে নিয়ে পালালো সেটাকে। কোনো আমওয়ালাই কিনা কে জানে!' আমার চোখে জল এলো তারপর।

'একি! বেশ আংটি তো—দেখি একবার! ঘড়ির দোকানে এই আংটি কেন ? কত দাম এই আংটিটার ?'

'দেড় হাজার।' তিনি বললেন—'আর আরো ছোট এটার—এটার দাম আড়াই হাজার টাকা। এটা লেডিজ কিনা।'

'হীরের আংটি বুঝি ? খুব দামী হীরে তো!' বলতে হয় আমায়।

'হীরের নয়, ঘড়ির। আংটির মাথায় ছোট্ট এইটুকুন ঘড়ি বসানো আছে দেখতে পাচ্ছেন না ?'

ওমা! তাই ত বটে। ওষুধের টেবলেটের মত, সেই আকারের একটা ঘড়ি—পাথরের মতন আংটির মাথায় বসানো। লক্ষ্য করলে তার ভেতরেই ঘণ্টার আঁচড় ঘড়ির কাঁটা·· খুদে খুদে চেহারার··· দেখা যায় সব।

নাঃ, এবার এখান থেকে কাটতে হয়। এ দোকানের ঘড়ি-টড়ির যা দাম তা আমার কেনা-কাটার মধ্যে নয়। আমার নাগালের বাইরে

সব। কিন্তু কি বলে কাটি? এতক্ষণ ধরে এতগুলোর দাম-দর করলাম, ভদ্রলোকের সময় নষ্ট করলাম এতক্ষণ, একেবারে কিছু না নিয়ে চলে যেতে কেমন লাগছিল! কোথায় যেন বাধছিল আমার।

তাই একটু কিন্তু কিন্তু হয়ে বললাম—'আপনার দোকানের ঘড়ি-টড়ি সব দেখলাম। বড় ক্লক থেকে ছোট টাইমপিস পর্যন্ত, ছোট-বড় হাত-ঘড়ি কিছুই বাকী রইল না। আংটি ঘড়িও দেখা গেল, জীবনে আমার ঘড়ির অভিজ্ঞতা এই প্রথম। প্রচুর জ্ঞান লাভ করলাম। জানলাম যে ঘড়ির আকার যতই ছোট হবে দামও হবে ততই জেয়াদা। তাই···তাই···আমি ভাবছি·· না-ঘড়ির দাম কত হবে তাই আমি ভাবছি।'

'না-ঘড়ি? না-ঘড়ি আবার কি মশাই?'

'মানে, একেবারে যদি কোন ঘড়ি না কিনি, কিছু না কিনেই আমি চলে যাই তাহলে আমাকে কত দিয়ে যেতে হবে সেই কথাই আমি জানতে চাইছিলাম।'

'মানে?' ভদ্রলোককে যেন একটু বিস্মিতই বোধ হল।

'মানে, ঘড়ি যত ছোট হবে ততই ত তার দাম বেশি হবে, তাই ঘড়ি যদি একেবারে শূন্য হয় তাহলে কত দিতে হয় তাই আমার জ্ঞাতব্য।'

'ও তাই? না, তাহলে আপনাকে কিছুই দিতে হবে না। উল্‌টে আমরাই আপনাকে কিছু দেব।'

'তাই নাকি?' এবার আমি অবাক্।

'হ্যাঁ। একটা আধুলি দেব আপনাকে।' জানালেন ভদ্রলোক।

'তাই নাকি? বাঃ বাঃ, তাহলে ত বেশ।' শুনে আমি উল্লসিত হই: 'সে ত খুব ভালো কথাই। সকালে কিছু না খেয়েই বেরিয়েছি।

আট আনা পয়সা পাওয়া গেলে একটা মোগলাই পরোটা আর এক কাপ চা খাওয়া যায় এখন।'

'দিচ্ছি, এই যে, দয়া করে একটু পিছন ফিরে দাঁড়ান।'

দাঁড়ালাম। দাঁড়াতেই পেছন থেকে কানে এল···'আধুলি মানে একটি অর্ধচন্দ্র। আধুলিকে সাধু ভাষায় ঐ ত বলে থাকে, তাই না?' বলে আমার উত্তরের অপেক্ষা মাত্র না করে ভদ্রলোক আমার ঘাড় ধরে পেল্লায় এক ধাক্কা মারেন। আর সেই ধাক্কাতেই আমি ঘড়ির দোকান থেকে গড়িয়ে ফুটপাথে···

ফুটপাথে এসে চিৎপাত!

জুজু

এক বাঘের মুল্লুক থেকে আরেক বাঘের মুল্লুকে ! হাজারিবাগ থেকে বাগেরহাট।

হাজারিবাগে আমার সেজমামার বাড়ি। তাঁর ইলেক্‌ট্রিক্যাল গুড্‌স্‌-এর কারবার। সেই সঙ্গে ছোটখাট একটা কারখানাও ছিল তাঁর। যেখানে বিদ্যুতের যন্ত্রপাতি জিনিসপত্তর মেরামত হত। মোটরের যন্তরটন্তর, পাখাটাখা, হীটার, মীটার—এসব সারাতে জানেন সেজমামা।

বিদ্যুতের কত রকম যে কেরামতি, তা একমুখে ব্যক্ত করা যায় না। আমিও কিছু কিছু শিখছিলাম সেজমামার কাছে। একদিন সেজমামার মতই ওস্তাদ হব এইরকম আশা মনে মনে পোষণ করছি এমন সময়···

এমন সময়ে বাগেরহাট থেকে মেজমামার তলব এলো—শিবুকে আমার কাছে পাঠিয়ে দে তো একবার। শুনছি ওর শরীরের নাকি তেমন উন্নতি হচ্ছে না। ভাবছি যে আমি একবার চেষ্টা করে দেখি···

চিঠি পেয়ে সেজমামা বললেন, 'যা তাহলে তোর ব্যায়ামবীর মেজমামার কাছে। চেহারাটা বাগিয়ে তারপর আসিস আবার। আবার এসে লাগিস্—কেমন ?'

চেহারা বাগাতে চলে গেলাম বাগেরহাট।

আমাকে দেখে মেজমামা বললেন, 'ওমা ! সেইরকম লিকলিকেই রয়েছিস তো ! গায়পায় তো একটুও গত্তি লাগেনি। হাওয়ায় উড়ছিস যে রে ! জামাটা খোল তো দেখি।'

জামা খুলতে আমার দারুণ আপত্তি। চানের সময় যে খুলতে হয়

তাতেই আমার যেন মাথা কাটা যায়। জামা পরে চান করতে পারলে বাঁচি যেন। কাউকে গা দেখাতে হলেই আমি গায়েব।

মামার কথাটা আমি গায়ে মাখি না, কানে যেন যায়নি কথাটা এমনিভাবে টিপ্ করে একটা প্রণাম ঠুকে দিই।

'হবে হবে, পরে হবে প্রণাম—আগে জামাটা খোল।' বলে মেজমামা নিজেই আমার কোটের বোতামগুলো খুলতে লাগলেন। খোলস খুলতেই আমার খোলতাই জাহির হল। 'ওমা, এই চেহারা!' আঁৎকে ওঠেন মেজমামাঃ 'হাড় পাঁজরা যে গোনা যাচ্ছে রে সব। দেখি, কখানা, এক দুই তিন চার··· ।'

আঙ্গুল ঠুকে ঠুকে মেজমামা আমার পাঁজরার অগণ্য হাড় গণনা করেন···

'যাক্, এতেই হবে। এই-তোকেই আমি বাগেশ্রী বানিয়ে দেব। একবার বাগে যখন পেয়েছি—দেখিস!'

'মেজমামা, আমার ওপর তোমার এত রাগ কেন?' ভয়ে ভয়ে বললাম।

'কেন, রাগের কথা কি হল?'

'বললে যে আমায় বাগেশ্রী বানাবে। বাগেশ্রী তো একটা রাগ-রাগিণী।'

আমার গাইয়ে ছোটমামার কাছ থেকে এ খবর আমার জানা ছিল।

'আহা, সে বাগেশ্রী নয়। এ হচ্ছে আলাদা। বাগেশ্রী মানে বাগেরহাটের শ্রী। ওরফে বাগেশ্রী। বাগেরহাটে ফি বছর সুঠাম চেহারার প্রতিযোগিতায় যার দেহ সবচেয়ে সুগঠিত সুন্দর বলে গণ্য হয় সে-ই ওই খেতাব পায়। আসছে বছরের বাগেশ্রী হচ্ছিস তুই!···চ, এবার আমার ব্যায়ামাগার দেখবি চ।'

বলে তিনি উৎসাহভরে আমার পিঠে একটা চাপড় মারলেন। তাঁর সেই স্নেহের চাপড়ানিতে আমি তিন হাত ছিটকে গেলাম। এগিয়ে গেলাম ব্যায়ামাগারের দিকেই।

সেখানে গিয়ে দেখি, ইলাহী কাণ্ড! ছেলেরা তাক ঠুকছে, কুস্তি লড়ছে, ডন-বৈঠক মারছে। ধুলো মাটি মেখে সব কিম্ভুত চেহারা। মুগুর ডাম্বেল বারবেলের ছড়াছড়ি। তারই একধারে একটা বৈদ্যুতিক ওজনযন্ত্রও রয়েছে। যন্তরটা আমার পরিচিত। সেজ-মামাকে এমন যন্ত্র আমি মেরামত করতে দেখেছি।

'আয় তোর ওজনটা নিই একবার।' যন্ত্রটার দিকে মেজমামা আমায় আহ্বান করলেন।

'আজ নয় মেজমামা, তোমার এখানে খেয়েদেয়ে ব্যায়াম-টায়াম করে ওজনটা একটু বাড়ুক আগে, তারপর।' আমি বললাম।

'ছেলেদের শরীরগুলো দেখেছিস?' আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন মেজমামা: 'এখানে ব্যায়াম করে এমনি হয়েছে। আরও হবে! ভালো করে চেয়ে ছাখ।'

না দেখে উপায় নেই। না চাইতেই দেখা দেয় এমনি সব চেহারা। তারস্বরে নিজেদের ব্যায়ামবার্তা ঘোষণা করছে। প্রত্যেকেরই দেহ বেশ সুগঠিত। তার মধ্যে একজনের, বয়সে আমার চাইতে তেমন বড় হবে না হয়ত, কিন্তু চেহারায় একেবারে পেল্লায়।

নামেও প্রায় তার কাছাকাছি। মামার ডাকেই জানা গেল।

'পেল্লাদ এদিকে এসো।' মামা তাকে ডাক দিলেন।

পেল্লাদ এগিয়ে এলো। 'একে একটু দেখিয়ে দাও।' বললেন মেজমামা।—'একে একচোট দেখাও তো!'

শুনেই আমার পিলে চমকে যায়। কিন্তু না, আমাকে নয়, নিজেকেই সে দেখাতে লাগলো।

সারা দেহটাকে ভেঙে-চুরে দুমড়ে বেঁকে এমনভাবে সে দাঁড়ালো যে, হ্যাঁ, দেখবার মতই বটে। গায়ের পায়ের মাংসপেশীগুলো ফুলে ফুলে ফেঁপে উঠলো সব—ইয়া হলো তার বুকের ছাতি, গলার কাছটা যেন দলা পাকানো—আর, এইসা হাতের কবজি। বক দেখানোর মতন হাতটা দুমড়েছে আর তাইতেই তার বাহুর কাছটা তিন ডবোল হয়ে এমনটা হয়েছে যে ভাষায় তার বর্ণনা করা যায় না। বর্ণনা করা বাহুল্যমাত্র বলে মানে, বাহুর বাহুল্যমাত্র, এই বলেই প্রকাশ করতে হয়।

'এই হচ্ছে আমাদের বাগেশ্রী। আগামী নয়, আসন্ন। এ বছরের পাল্লায় আমরা একেই নামাবো।' মেজমামা জানালেন। এবারের গেল এ, 'আর আসছে বারের মানে, আমাদের আগামী বছরের, বাগেশ্রী হচ্ছিস তুই · '

কথাটা কানে যেতেই পেল্লাদ এমন রোষকষায়িত নেত্রে আমার দিকে তাকালো যে তা আমি ইহজীবনে ভুলবো না। পেল্লাদের চেহারায় যেন জল্লাদের রূপ দেখলাম। এবারের বাগেশ্রীর সারা দেহে তো ফুটে ছিলই, এবার যেন তার চোখের থেকেও বাঘের শ্রী ফেটে পড়তে লাগল। বাঘের মতন হিংস্র দৃষ্টি দেখা দিল তার দু চোখে।

'পেল্লাদ, এবং তোমরা সকলেই শোনো', গলা খাঁকারি দিয়ে ঘোষণা করলেন মেজমামা—'আজ থেকে এ. মানে শিবু, আমার ভাগ্‌নে—এই হবে তোমাদের সর্দার। একে তোমরা শিবুদা বলে ডাকবে। ওরফে রামদাও বলতে পারো। একে তোমরা আমার মতই মেনে চলবে। আর এ যা বলবে, মন দিয়ে পালন করবে তোমরা সবাই—বুঝলে?'

এইভাবে বুঝিয়ে দিয়ে মেজমামা তো ব্যায়ামাগার থেকে চলে গেলেন। আর মেজমামা সরে যেতেই পেল্লাদ ফোঁস করে উঠল

সক্কলের আগে—'হ্যাঁ, ঐ রামফড়িংকে আমরা রামদা বলবো। ও-তো এক ফুঁয়েই উড়ে যাবে আমার।'

'ফড়িংদা বলে যদি ডাকি পেল্লাদদা?' জিগ্যেস করল একটা বাচ্চা ছেলে।

'তা ডাকতে পারিস ইচ্ছে করলে। আমি ডাকবো ফড়িং বলে। শুদ্ধু ফড়িং। দাদা-ফাদা বলতে পারব না।' ফড় ফড় করে পেল্লাদ: 'আর ঐ ফড়িংটা যদি আমার কাছে সর্দারি ফলাতে আসে তাহলে এক গাঁট্টায়। না, গাঁট্টা না, আমার আঙুলের এক টোকায় উড়িয়ে দেব তোমায়, বুঝলে বাপু রামফড়িং!'

বলে পেল্লাদ আকাশের গায় একটা টোকা মারল। আর পেল্লাদের কাণ্ড দেখে খোকারা হেসে উঠল সবাই। হাসল পেল্লাদও। পেল্লাদের আহ্লাদ দেখে আমি আর বাঁচিনে।

কিন্তু মরণ-বাঁচন সমস্যাটা দেখা দিল তার পরদিন। মামা সকালে উঠে বললেন—'কাল ছেলেদের আমি সব বলে রেখেছি আজ সকালে এসে ব্যায়ামাগারের মাঠের ঘাসগুলো ছাঁটাই করতে। যাও, গিয়ে দেখো তো কদ্দুর এগুলো। তুমি যখন ওদের সর্দার তখন তোমাকেই তো এখন তদারক করতে হবে এসব। কাজটা করিয়ে নাওগে ওদের দিয়ে।'

গিয়ে দেখি, পেল্লাদকে নিয়ে জটলা পাকিয়ে মাঠে বসে আড্ডা মারছে সবাই।

আমি বললাম—'একি! একটা ঘাসের ডগাও তো ছাঁটোনি দেখছি। গল্প করছো সবাই বসে—এদিকে এতটা বেলা গড়িয়ে গেল! নাও, চটপট গা লাগাও সব।'

'যদি না লাগাই তো তুমি কি করতে পারো শুনি?' গর্জে উঠল পেল্লাদ।

'তাহলে আমাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।' ভারী গলায় আমি ছাড়লাম।

'কী ব্যবস্থা করবে শুনি তো একবার?'

'আমি···আমি···মানে···মানে···' বলে আমি একটা ঢোঁক গিললাম। তাতে আমার মানের যে খুব হানি হল বুঝতে পারলাম বেশ।—'আমি বলছিলাম কি', আমতা আমতা করে বললাম—'বৃথা আলস্যে কালাতিপাত না করে তোমরা নিজেদের কর্তব্য কর্মে লিপ্ত হও ভ্রাতৃবৃন্দ! এই কথাই বলছিলাম আমি।'

সাধু উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়েই আমার বলা, এইটে জানাবার জন্যই সাধুভাষা ব্যবহার করলাম।

'যদি না লিপ্ত হই?' বলে পেল্লাদ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। মারমূর্তি ধরে আমার সামনে খাড়া হল সে।

'তাহলে···তাহলে কি তুমি আমায় মারবে নাকি?'

'না না। সে কথা কি আমি বলেছি? তোমার মতন ছেলেকে কি আমি কখনো মারতে পারি?' যথাসাধ্য আত্মমর্যাদা বজায় রেখে বলি: 'তবে আমি বলছি কি, তোমরা যদি চটপট ঘাস ছাঁটতে না লাগো তাহলে ভীষণ প্যাঁচে পড়বে।'

'কিসের প্যাঁচ?'

'জুজুৎসুর। এমন জুজুৎসুর প্যাঁচ করে দেব যে এক মিনিটের মধ্যে হাড়গোড় ভাঙা দ হয়ে যাবে তুমি।'

'জুজুৎসু?'

'কেন, জুজুৎসুর নাম কি শোনোনি নাকি কখনো? একরকমের জাপানী কসরত। একশো গুণ গায়ের জোর বেশী এমন একটা পালোয়ানকে একরত্তি একটা জাপানী ছেলে দুটো আঙুলের কায়দায় একেবারে ঘায়েল করে দিতে পারে—শোনোনি কখনো?'

পেল্লাদের একটা সাকরেদ মাথা নেড়ে জানালো যে এমন কথা সে শুনেছে বটে।

'তুমি জানো জুজুৎসু?' জিগ্যেস করল পেল্লাদ। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে।

'জানি কিনা টের পাবে এই দণ্ডেই। কিন্তু ভগবান না করুন—যেন আমায় তা না জানাতে হয়। এর আগে একটা গুণ্ডা ছুরি নিয়ে আমায় তাড়া করেছিল, তাকে আমি ঐ প্যাঁচে ফেলেছিলাম। বেচারাকে পাক্কা ছ মাস হাসপাতালে কাটাতে হল! মারা যেতে যেতে বেঁচে গেল কোনোরকমে।'

'তবে রে ব্যাটা রামফড়িং! তুই আমাকে জুজুৎসুর প্যাঁচে ফেলবি?' এই না বলে পেল্লাদ একলাফে এগিয়ে এসে আমার ঘাড় ধরলো। ঘাড়ের কাছটায় কোটের কলার ধরে আমাকে উঁচু করে তুলল আকাশে।—'প্যাঁচটা তবে ছাখ এইবার। তোকে তুলে এমন এক আছাড় মারবো···' বলে সে কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে সুর করে আওড়ালে···'মারিব আছাড়। ভাঙিবে মাথার খুলি চূর্ণ হবে হাড়।'

ত্রিশঙ্কুর মতই হল আমার অবস্থা। ত্রিশূন্যে উঠে আমি হাত-পা ছুঁড়তে লাগলাম—'ভালো—ভালো হচ্ছে না কিন্তু! এমনিভাবে আমাকে ঘাড় ধরে তোলা···আমি আঙুলের কায়দা দেখাতে পারছি না কিনা · যদি একবার তোমায় আমার আঙুলের নাগালে পাই তো দেখতে পাবে মজাটা।'

'তুই আমায় মজা দেখাবি? বটে রে ব্যাটা রামফড়িং?' বলে সে আমাকে নামিয়ে দিল মাটিতে: 'তার আগে এক ঘুষিতে—আমার হাতের এই এক ঘুষিতে তোর মাথাটা আমি চ্যাপটা করে দেব—নাক-মুখ সব নিয়ে তোর মাথাটা—বসিয়ে দেব তোর গলার ভেতর···কোটের কলারের তলায়···ঘাড়টাড় সমেত। কন্ধকাটার মতন ঘুরে বেড়াবি তখন।'

'তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি পেল্লাদ', ভারী গলায় ঘড়ঘড় করে : 'ফের যদি তুমি এরকম বেয়াদবি করো তো পরজন্মে গিয়েও পস্তাতে হবে। ভালো কথায় বলছি, খুব বেঁচে গেলে এ যাত্রা।'

পেল্লাদ, বলতে কি, এবার একটু ভ্যাবাচাকা খেয়েছে। আমি বেশ ভড়কে যাব ও ভেবেছিল। কিন্তু এততেও আমার মুখসাপট দেখে ও একটু ঘাবড়ে গেল।

'দাঁড়া, এবার তোকে ঠ্যাং ধরে তুলবো আকাশে।' বলে এগিয়ে এসেও আমার শ্রীচরণে হাত দেবার তার কোনো তাড়া দেখা গেল না। অদূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো আমায়।

তারপরে একটু নরম হয়ে বলল—'না। আগে তুমি আমায় এক ঘা মারো! আমি আইন বাঁচিয়েই চলতে চাই। তারপরে তোমায় ধরে আমি তুলো ধুনে দিচ্ছি। বলতে পারব তখন যে আগে আমার গায় তুমি হাত তুলেছিলে। মারো আমায় এক ঘা আগে।'

সে বুক চিতিয়ে খাড়া হল আমার সামনে।

'না, আমি তোমার গায়ে হাত দেব না। ভদ্রলোক কি মারামারি করে? ভদ্র বালকও তা করে না। কেন, মারামারি করা ছাড়া কি গায়ের জোরের পরীক্ষা হয় না? আচ্ছা, ঠিক করে বলো তো, আমি সর্দার হওয়াতে তোমার খুব রাগ হয়েছে আমার ওপর, তাই না?'

'ঠিক তাই।' মেনে নিল সে…'ইচ্ছে করছে, আস্ত তোমায় চিবিয়ে খাই।'

'আমি কি করব? আমি তো নিজের থেকে সর্দার হতে চাইনি, মামা করেছে। আমি কি করব? বেশ, আমাদের মধ্যে কার গায়ের জোর বেশী তার পরীক্ষা হয়ে যাক। যার বেশী জোর সে-ই সর্দার হবে, তাকে সর্দার বলে মানবে সবাই—এর ওপর তো কোনো কথা

মন তো? সেই হবে সর্দার। তার কথায় সবাইকে [illegible]খন। কেমন, এতে রাজী?'

'হ্যাঁ, রাজী।' সায় দিলে পেল্লাদ। ছেলেরাও বেশ জোরদার উৎসাহ দেখাল।

'বেশ, ঐ যে বারবেলটা পড়ে আছে ওখানে—ওজনদাঁড়ির ওপর' ...অদূরে দাঁড়া করা বৈদ্যুতিক ওজন-দাঁড়িটার পাটাতনে একটা সের পনেরর লোহার বারবেল পড়েছিল—সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে বললাম—'ঐ বারবেলটা যে মাথার ওপর তুলতে পারবে...'

'ঐ বারবেল তো আমি দুবেলা ভাঁজি।' কথার মাঝখানেই বাধা দিল পেল্লাদ—'মাথার ওপর ঘোরাই দুবেলা। বুঝেছ হে?'

'বেশ তো, তুলেই দেখাও না একবার। পরীক্ষাটা হয়ে যাক সবার সামনে।' আমি বললাম।

'বেশ, তুমি আগে তোলো তো দেখি। তোমার জোরটা দেখা যাক একবার। তোলো। দেখি।'

ছেলেরাও বলতে লাগলো—'তোলো রামদা, তোলো!'

এত তোলো তোলো শুনে তুলাদণ্ডের ওপর থেকে বারবেলটাকে তুলতে হোলো। বলতে কি, তুলতে গিয়ে বেগ পেলাম বেশ। দু'হাতে না সাপটে ধরে অতিকষ্টে হাঁটুর উপর তুললাম, তারপর আস্তে আস্তে কাঁধ বরাবর। শেষে প্রাণান্ত এক পরিশ্রমে মাথার ওপর খাড়া করলাম ওটাকে।

'এইবার তোমার পালা!' বারবেলটাকে নামিয়ে রেখে আমি দেয়ালে গিয়ে ঠেস দিয়ে হাঁফ ছাড়তে লাগলাম। বাপ্!

পেল্লাদ এসে পাকড়ালো বারবেলটাকে। —'এক ঝট্‌কায় তুলে ফেলব দ্যাখো না! তোরা সবাই চেয়ে দ্যাখ।'

বলে বারবেলটাকে ধরে এক ঝট্‌কা মারতে গেল সে। মারতে

গিয়ে, কী আশ্চর্য! অবাক্ কাণ্ড! পট্‌কালো সে আপনাকেই। উল্‌টে পড়লো মেজেয়!

'হাত পিছলে গেল কিনা।' বলে গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালো পেল্লাদ। মাটিতে হাত ঘষে লাগতে গেল আবার; কিন্তু —তার ঐ লাগাই সার, বাগাতে পারল না একটুও ওটাকে। এক ইঞ্চিও নড়াতে পারল না বারবেল। আমি ঠায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মৃদুমধুর হাসতে লাগলাম।

ওর বাহুর পেশী ডবোল হয়ে উঠলো—আবার দেখা গেল তার বাহুল্য! বুক ফুলে উঠলো দেড়গুণ। হাপরের মতন নিশ্বাস পড়তে লাগল ওর। কিন্তু এক চুলও তুলতে পারল না বারবেলটা।

'যাও, কাজে মন দাও গে।' বললাম আমি তখনঃ 'সাফ করে ফ্যালো মাঠটা। মাঠ পরিষ্কার না হলে আমাদের বার্ষিক উৎসব হবে কি করে? এ বছরের সভা বসবে তো ঐখানেই, বাগেরহাটের ইতর-ভদ্র দেখতে আসবে সবাই! আর, সেই সভায় তুমিই তো এবার বাগেশ্রী হবে, পেল্লাদ! তোমার গরজই তো সবার বেশী হওয়া উচিত ভাই!'

'হাঁ রামদা' বলে সদলবলে নতমস্তকে সে চলে গেল। সর্দার বলে মনে মনে মেনে নিল আমায়।

তারপর পেল্লাদের সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল খুব। সে আমার বিশেষ ভক্ত হল একজন।

সেদিন সন্ধ্যাতেই সে এসে শুধালে আমায়—'এই তো আমি এইমাত্র সেই বারবেলটা ভেঁজে এলাম! সকালে আমি তুলতে পারলাম না কেন বল তো? বল না রামদা, তুমি কি আমায় কোনো জুজুৎসু করেছিলে?'

'বারে! আমি তোমায় ছুঁতে গেলাম কখন?' প্রতিবাদ করি

আমি : 'না ছুঁয়ে কি কাউকে কিছু জুত করা যায়? জুজুৎসুও করা যায় না।'

'তাহলে বুঝি ওই বারবেলটাকেই··· ? ওটা তো তুমি আগেই ছুঁয়েছিলে। বেশ জুত করেই তুলেছিলে আমার আগে।'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারো।' বলে আমি ঘাড় নাড়ি—যে ঘাড় ওটার উত্তোলনে সকাল থেকেই টনটন করছিল আমার।

'তাই! তুমি জানতে যে, জুজুৎসুর প্যাঁচ কষে দিয়েছ ওটাকে। কিছুতেই আমি আর তুলতে পারব না। তাই তুমি দেয়ালে হেলান দিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিলে অমনি করে—আমি লক্ষ্য করেছিলাম।'

যে রহস্য বাল্যকালে পেল্লাদের কাছে আমি ব্যক্ত করতে পারিনি, আজ সেটা ফাঁস করবার আমার বাধা নেই।

হাজারিবাগের মামার কাছ থেকে আসবার সময় আমি একটা বিদ্যুৎ-চুম্বক বাগিয়ে আনি। আর সেদিন সকালে বাগেরহাটের মাতুল-সাক্ষাতের আগে, সেটাকে বৈদ্যুতিক ওজন-যন্ত্রটার পাটাতন তুলে তার ভেতর লুকিয়ে রেখেছিলাম। তারপরে পেল্লাদ বারবেলটা তুলবার সময় যখন আমি দেয়ালে ঠেস দিয়ে মৃদুমধুর হাসছিলাম তখন আমার পিঠের পেছনে যে ইলেকট্রিক সুইচ ছিল, চেপে ধরেছিলাম সেটাকে। ফলে ওজন-যন্ত্রের সঙ্গে সংলগ্ন তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে উপজাত বৈদ্যুৎ চৌম্বক বারবেলটাকে প্রচণ্ড শক্তিতে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। ওটাকে তুলতে হলে গোটা ওজনযন্ত্র সমেত তখন তুলতে হত পেল্লাদকে। যার মোট ওজন তখন পেল্লাদের পাঁচশো গুণ।

আমার বৈদ্যুতিক মামার দৌলতে এটা জানা ছিল আমার।

ঢিল থেকে ঢোল

তিল থেকে যেমন তাল হয়, ঠিক সেই রকমই প্রায়। ঢিল থেকে ঢোল। সামান্য এক টুকরো ঢিলের থেকে ফেঁপে-ফুলে ঢোল।

আমের আশা নিয়ে মামার বাড়ি বেড়াতে গেছি আমতায়। ফি-বছরই যাই।

ইস্টিশন থেকে নেমে মাইল সাতেক হাঁটতেই দুপুর গড়িয়ে গেল। বারোটা বাজিয়ে পৌঁছলাম মামার বাড়ি।

বাড়ির ভেতরে পা দিয়েই আমি অবাক্! উঠোনের উপরেই এক দৃশ্য! আমার মামাত ভাইবোনেরা সার বেঁধে সবাই হাঁটু গেড়ে বসে। মামীমা এক ধারে দাঁড়িয়ে।

আন্দাজ করলাম মামীমা কোনো দোষের জন্য ওদের সাজা দিয়েছেন। এবার আমাকে হাতে পেয়ে আমাকে দিয়ে ওদের কান মলিয়ে দেবেন। ভেবে আমার খুব উৎসাহ হল। হাতের এতখানি সুখ হাতের নাগালে এলে কার না ভালো লাগে। এহেন আরাম সেই পাঠশালাতেই যা পেয়েছি। পেয়েছি এবং দিয়েছি। কষে ওদের কান মলে দেবার জন্য আমার হাত নিসপিস করতে লাগল। নিলডাউন-করা ভাইদের কান ডলতে আমি তৈরি হলাম।

আমাকে দেখেই মামাত-বোন মিনিটা তারস্বরে আউড়েছে :

ঠিক দুক্কুর ব্যা···লা···
ভূতে মারে ঢ্যা···লা···
ভূতের পায়ে রো···সি···
হাঁটু গেড়ে বো · সি···

'তার মানে?' আমি রাগ করলাম : 'দুপুরবেলা এসে পড়েছি

বলে আমাকে ভূত বলে গাল পাড়া হচ্ছে? আমি কী করব! তোমাদের হাওড়া-আমতার ট্রেন যেমন! আমাদের ধাপার লাইনকেও হার মানিয়ে দেয়।'

জবাবে কোনো কথা না বলে মীনা হু'বাহু বিস্তার করে দেখালো।

একটা হাত তার দেওয়াল-ঘড়ির দিকে—দেখলাম সেখানে বারোটা বেজে তিন মিনিট। আর একটা হাত উঠোনের উদ্দেশে—সেখানে একটা পাটকেল পড়েছিল···তার দিকে।

'ভূতে টিল মারছে আমাদের বাড়ি, জানো রামদা?' টুপসি জানায়, 'আজ কদিন থেকেই। যেই-না ঠিক বারোটা বাজে অমনি একটা হুটো করে ভূতের টিল এসে পড়ে—'

'আর অমনি না আমরা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে মন্তর পড়ি।' টুক্কু ব্যাপারটা আরো বিশদ করে!—'ঠিক তুক্কুর ব্যালা ভূতে মারে—।'

'ভূত না ঢেঁকি!' মন্ত্রপাঠে আমি বাধা দিইঃ 'এ বাড়ির ত্রিসীমানায় বেল গাছ কি শ্যাওড়া গাছ রয়েছে? তাই নেই ত ভূত আর পেত্নীরা আসবে কোথ্‌থেকে শুনি?' জিগ্যেস করি আমি, 'তবে হ্যাঁ, তোরা নিজেরাই যদি এই কাণ্ড করে থাকিস ত বলতে পারি না।'

বলে আমি উঠোনের পাটকেলটার দিকে তাকালাম। তার গতিবিধি লক্ষ্য করে একটু গোয়েন্দাগিরি ফলালাম আমার। শ্যাওলাপড়া উঠোনের মেজে ঘসে একটা তির্যকরেখা টেনে চলে গেছল পাটকেলটা।

সেই পাটকেলটা দিয়েই মেজের ওপর একটা সরলরেখা টানলাম। তারপর তার ওপর পারপেণ্ডিকুলার খাড়া করে অ্যাংগল কষে একটা ডিগ্রীর আন্দাজ বার করলাম। মনে হল আমাদের ঈশান কোণের দিক থেকে এসেছে ওই টুকরোটা—পাড়ার ওদিকে

বঙ্কুদের বাড়ি। এটা ছোঁড়া তা হলে সেই ছোঁড়ারই কাজ। সে ছাড়া আর কেউ নয়।

'বঙ্কিমের কাজ।' মুখ ব্যাঁকা করে আমি বললাম, তারপর বঙ্কিম-নেত্রে তাকালাম মিনির দিকে—'তোদের সঙ্গে কি তার কোনো ঝগড়াবিবাদ হয়েছিল ইতিমধ্যে ?'

'বাবা তাকে বকে দিয়েছে। আমাদের আমবাগানে গাছে উঠে আম খাচ্ছিল বসে বসে, তাই।'

'বকবেই ত!' সায় দিলাম আমি: 'কেন, ঢিল না ছুঁড়ে কি আম ছুঁড়তে পারে না ? গোছা গোছা আম ? তা হলে ত আমাদের কষ্ট করে আর গাছ থেকে পেড়ে খেতে হয় না। খাক-না যত খুশি—কিন্তু সেইসঙ্গে ছড়াক এন্তার। বলি, হনুমান কী করেছিল ? আমাদের এত আম এলো কোথ্ থেকে শুনি ? লঙ্কার থেকে···সব সেই হনুমানের আমদানি ! লঙ্কায় বসে খেয়েছে আর আঁঠিগুলো ছুঁড়েছে অযোধ্যার দিকে। ল্যাংড়া আমের আঁঠি যত।'

'বঙ্কুদাও ত তাই ছুঁড়েছিল।' ব্যক্ত করল টঙ্কু: 'ল্যাংড়া আমের আঁঠি···'

তোর মেজমামার টাক লক্ষ্য করে।' মামীমার প্রকাশ।

'তাতেই ত কাণ্ডটা বাধল।'

'বাবা খুব কষে বকে দিলেন। গাছের ডালে বসে ছিল ত। হাতের নাগালে পেলেন না। পেলে কী হত কে জানে।'

'কাণ্ড গড়াত আরো।' মিনি জানায়।

'ধরে কানডলা দিতেন বোধ হয়। আচ্ছা,—আমিই সেটা দিয়ে আসছি বঙ্কাকে।' বলে আমি বেরুলাম।

'বঙ্কিম, এটা তোমার কি রকম কর্ম ?' গিয়ে সাধু ভাষায় আমি শুরু করলাম—'আমাদের বাড়ি লক্ষ্য করে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা ?'

আমার কথায় বঙ্কিম ত' চট্টোপাধ্যায়! চটে উঠে বলল, 'লোষ্ট্র নিক্ষেপ! বলে, লোষ্ট্রর আমি বানান জানিনে, আর তাই নিয়ে আমি নাড়াচাড়া করব?'

'বঙ্কে, অঙ্কে আমি যতই কাঁচা হই, জ্যামিতিটা আমি ভালোই জানতাম, এটা তুমি মানবে। এই গাঁয়ের ইস্কুলে একদা তোমার সঙ্গে পড়েও ছিলাম কিছুদিন—তোমার মনে আছে নিশ্চয়?'

'ইস্কুলের পড়ার সঙ্গে ঢিল পড়ার কী সম্পর্ক শুনি? ঢিল কি কোনো পাঠ্যপুস্তক? পড়বার জিনিস। না পড়লেই নয়?'

'চালাকি রাখো। আমি অ্যাংগল কষে বার করেছি ঢিলটা আমাদের বাড়ির ঈশান কোণ থেকে…'

'ঈশানকাকার বাড়ির কোণ থেকে বলছ? ঈশানকাকা আমাদের পাড়ার কোনো ব্যাপারে থাকে না।'

'ঈশানকাকার বাড়ি ত আমাদের বাড়ির নৈঋত কোণে। আমাদের ঈশান কোণে তোমরা ছাড়া আর কেউ নেই। অর্থাৎ কিনা…'

'ঈশানকাকাকে বলো গিয়ে। ঈশান কোণের খবর তিনিই ভালো রাখেন। আমরা সে-সব জানিনে।' বলে সে আমার মুখের ওপর দড়াম্ করে বাড়ির দরোজা বন্ধ করে দেয়।

অগত্যা, গেলাম ঈশানকাকার কাছে। ঈশানকাকা সব শুনেটুনে বললেন—'এসব ভূতের কম্মো। বঙ্কা ত এখনো ভূত হয় নি। জ্যান্তই রয়েছে। ভূতে ঢিল মারছে—বুঝেছ? এখন ভূতের ওপর কি আমাদের কারো হাত আছে?'

'বঙ্কার আছে। বঙ্কার বাড়ির দিক থেকেই আসছে ঢিলগুলো—।'

'কী বললে? ভূতের ওপর বঙ্কার হাত? বঙ্কার ওপর ভূতের

হাত? ভূতের হাতে বঙ্কা? বঙ্কার হাতে ভূত? তুমি ভূত মানো না? ভগবানে তোমার বিশ্বাস নেই?' ঈশানকাকা ব্যাজার হলেন ভারী।—'আজকালকার ছেলেরা বেজায় নাস্তিক দেখছি।'

সেখান থেকে গেলাম পাশাপাশি আর ক'জনার বাড়ি। সনাতন-মেসো, পদ্মলোচন-পিসে, জনার্দন খাস্তগীর—এঁদেরকেও গিয়ে জানালাম কথাটা। কথাটা কেউ কানেই তুলতে চাইলেন না।

আসল কথা, বঙ্কা ভারী দজ্জাল ছেলে। তাকে ঘাঁটাবার সাহস নেই কারো।

পরের দিন দুপুরে আবার পড়লো ঢিল। এবার পর পর অনেক-গুলো। তার একটা ঠিক আমার নাক ঘেঁষে গেল। তাক আছে বটে বঙ্কার।

তক্ষুনি আমি চলে গেলাম রেল লাইনের ধারে। কোঁচড় ভরে কতকগুলো নুড়ি-নোড়া কুড়িয়ে আনলাম। সোজা উঠে গেলাম বাড়ির ছাদে।

আমাদের বাড়ির ঈশান কোণ, মানে বঙ্কার বাড়িটা বাদ দিয়ে, পাশাপাশি সব বাড়ির দিকে তাক করে ছুঁড়লাম নুড়িদের। আর নোড়াটা ছুঁড়লাম ঈশানকাকার বাড়ির কোণে—তাঁর দোরগোড়ায়।

দরজার উপর দড়াম্ করে আওয়াজ হতেই ঈশানকাকা, দেখলাম, খড়ম পায়ে বেরিয়ে এলেন—কে—কে—কে? দরজায় ধাক্কা মারে কে?

বাহিরে এসে ছাখেন, কেউ না।

ভূত। বললাম আমি মনে মনেই।—ভূতকে কি দেখা যায়? ভগবানকে? ঈশানকাকা, তুমি ভগবান মানো না, ছ্যা!

আশেপাশের সব বাড়ি থেকেই বেরুলো লোকেরা। পদ্ম-পিসে, সনাতন-মেসো, খাস্তগীর-খুড়ো সবাই বেরুলো।

বেরুলাম আমিও। কদ্দূর গড়ায় দেখতে।

ঈশানকাকা সোজা আমাদের বাড়ির ঈশান কোণের দিকে ছুটলেন খড়ম খটখট করে। বঙ্কার দরজায় গিয়ে খড়ম খুলে লাগালেন এক ঘা।

বঙ্কাকে নয়, দরজাকে। কিন্তু তাতেই কাজ হল। দরজা খুলে বেরিয়ে এল বঙ্কু।

'আমাদের বাড়ি ঢিল ফেলেছিস কেন রে হতভাগা?' খড়ম আস্ফালন করে তিনি বললেন।

'আমি ঢিল ফেলেছি!' বঙ্কু আকাশ থেকে পড়ে। ঢিলের মতই পড়ে ঠিক।

'তুই ছাড়া আবার কেটা?' বলেন পদ্ম-পিসে, 'টঙ্কাদের বাড়ি তুই ফেলেছিলি ঢিল। আজ আমাদের বাড়ি ফেলেছিস।'

'তোকে আজ আর আস্ত রাখব না।' বললেন খাস্তগীর। বলেই চটপট চটাচট ঘা কতক চড়-চাপড় বসিয়ে দিলেন এলোপাথাড়ি। তারপর তার চুলের মুঠো ধরলেন কসকসিয়ে। চড়চড়ির পর মনে হল, মুড়োঘণ্ট রাঁধবার ইচ্ছে তাঁর।

'সত্যি বলছি ঈশানকাকা, আমি ঢিল ফেলি নি…'

তার জবাবে ঈশানকাকা খড়মের এক ঘা বসালেন ওর মাথায়। দেখতে না দেখতে ঢিলটা ওর মাথাব ওপরেই দেখা দিল। ফুলে উঠল মাথাটা।

'আমি কেবল টঙ্কুদের বাড়ি ফেলেছিলাম…' কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলল বঙ্কু: 'তোমাদের বাড়ি আমি ফেলি নি বলছি।'

'টঙ্কুদের বাড়িই বা ঢিল ফেলবি কেন রে বদমাশ?' ঈশানকাকার আরেক ঘা খড়মের খটাস্।

'আমি বলতে পারি কে ফেলেছে ঢিল। ঐ শিবেটা—'

বঙ্কু আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেঃ 'আমার উপর রাগ আছে ওর···'

'তোর বাড়িতে পড়েছে ঢিল? জিগ্যেস করেন পদ্ম-পিসে।

'না—না তো!' স্বীকার করতে হয় বঙ্কুকে।

'তবে? তোর উপর যদি রাগ ওর, তবে তোর বাড়ি না ফেলে ফেলতে যাবে আমাদের বাড়ি?' খাস্তগীরের আরেকটা আস্ত কিল।

'তোমার ছাড়া আর কারো কাজ নয় বাপু! পরের বাড়ি ঢিল ফেলাই তোমার অভ্যেস। আজ এর বাড়ি, কাল ওর বাড়ি। পরশু তার বাড়ি ··বড্ডো বাড় বেড়েছো তুমি। আমাদের বাড়ি ঢিল ফেল, তোমার অ্যাদ্দূর আস্পর্ধা।'

'পাড়ায় বাস করে পড়শীদের বাড়ি ঢিল···'

'না, এত বাড়াবাড়ি ত ভালো না। আজই এর হেস্তনেস্ত করব,' বলে খাস্তগীর বঙ্কুদের বাড়ির লাগাও বাঁশঝাড়ের দিকে এগুলেন। যুতমত মজবুতমত আস্ত একটা বাঁশ, ঝাড়ের থেকে ভাঙতে লাগলেন।

এই সুযোগে এগিয়ে আমি কষে বঙ্কার কান মলে দিলাম। কান ধরে বললাম—ওরে বঙ্কা, দেখছিস কি! ঝাড়ে-বংশে শেষ করবে তোদের। পালা এক্ষুনি, দেখছিসনে তোদের বংশলোপ করছে—এর পর তোর বাবার বংশলোপ করবে। এই কথাটা ফিসফিস করে বললাম ওকে।

বলতেই বঙ্কু টান মেরে কান ছাড়িয়ে তীরের মত ছুট্ মারল। সাত মাইল দূরে ইস্টিশনে গিয়ে বিনাটিকিটে গাড়ি চেপে সটান চলে গেল মামার বাড়ি হাওড়ায়। মারের হাত থেকে বাঁচতে হাওয়া!

পড়শীর মায়া

আমার বন্ধু নৈনিতাল যাবার আগে তার একটি তাল যে আমার উপর ঠুকে যাচ্ছে তখন তা বুঝতে পারি নি, টের পেলাম পরে।

'পড়শীর মায়া কাটিয়ে যেতে হচ্ছে!' বলে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললো সে।

পড়শীর প্রেমে তাকে বিগলিত দেখে আমি বিচলিত হলাম—'প্রতিবেশীর প্রতি বেশি ভালোবাসা দেখছি যে! এর মানে?'

'মানে, আমার যে তাদের ওপর মায়া খুব, তা নয়। আমার অভাবে তারা মনে কষ্ট পাবে সেই ভেবেই আমার দুঃখ।' বলে তার আবার আরেক ফোঁস: 'আমি চলে গেছি একথা যদি তাদের না জানানো যেত···আহা!'

'বাহা।' আমি বলি; 'তুমি চলে যাবে আর তারা সে খবর পাবে না তা কি করে হয়?'

'হয়। যদি তুমি ভাই আমার হয়ে, মানে তুমি যদি আমার এই অভাব মোচন করো।'

'না ভাই, আমি তোমায় ধার দিতে পারব না। আমার টাকা নেই।'

'টাকার কথা হচ্ছে না, আমি বলছিলাম কি, আজন্ম তো বাসা আর মেসে কাটালে, দিন কতক বাড়িতে কাটাও না? আমি নৈনিতালে বদলি হয়ে যাচ্ছি, কদ্দিনের জন্য কে জানে, আমার অমন বাড়ি তো খালিই পড়ে থাকবে। ওয়েল ফার্নিশড্ হাউস—খাট বিছানা দেরাজ আলমারি সোফাসেটি সবই এখানে থাকবে, কিছুই

নিয়ে যাব না। তার উপর ফ্রীজ আছে, ফ্যান আছে, ফোন আছে —আর কি চাও? বাসার ভাড়া না গুণে যদ্দিন না আমি আসি আমার বাড়িতে গিয়ে বাস করো না কেন?'

'তোমার অত বড় বাড়ির ভাড়া দেব কোত্থেকে?'

'ভাড়া কে চাইছে তোমার কাছে। কেয়ারটেকার হয়ে থাকবে তো। আমার চাকরকে রেখে যাব। সেকেণ্ড ক্লাস সার্ভেণ্ট ওরফে ফার্স্ট ক্লাস কুক। সব রকম রান্না জানে। তার বেতনটা কেবল তোমায় দিতে হবে।'

'তা না হয় দিলুম। কিন্তু তোমার অভাব মোচনের কথা বলছ যে! আমার দ্বারা কি করে হবে সেটা? তোমার পড়শীরা যখন তোমায় দেখতে পাবে না…।'

'মাথাও ঘামাবে না। ঘরে আলো জ্বললে তারা ধরে নেবে আমি আছি, কোথাও হয়ত কাজে বেরিয়েছি, ফিরবো এখুনি— এমনি কিছু একটা তারা আঁচ করে নেবে। আমার চাকরকে দেখতে পেলেই তারা বুঝবে আমি আছি—বুঝলে কিনা।'

'তুমি চলে যাবে আর তারা সেটা দেখতে পাবে না?'

'আমি নিশুত রাত্রে কাটবো আজ রাত্রেই, খালি একটা সুটকেস হাতে নিয়ে। তুমি কাল সকালে সুবিধেমত গিয়ে সেখানে উঠো, কেমন? চাকরকে আমি বলে যাবো সব।'

সকালে যখন বন্ধুর বাড়িতে পা বাড়ালুম, দেখি ড্রইংরুম ভর্তি লোক। একখানি খবরের কাগজ নিয়ে পড়েছেন সবাই।

সেরা কুশন-চেয়ারটিতে একটি যুবক ত্রিভঙ্গ হয়ে বসে। অপরিচিত হলেও আমাকে তিনি অভ্যর্থনা করলেন, 'আসুন! এই প্রথম আসছেন বুঝি এখানে?' বলে তাঁর পাশের আসনটিতে বসতে বললেন।

'তা হ্যাঁ, বলতে পারেন বটে' বলে আমি বসলুম।

'এ পাড়ায় সবে এসেছেন মনে হচ্ছে?' তিনি শুধালেন আবার।

'সে কথা সত্যি।' সায় দিতে হল আমায়।

'ভদ্রলোক আজ নেই', তিনি জানালেন: 'থাকলে এতক্ষণ চা হত আমাদের। চাকরটা আছে কিন্তু সে কোনো কথা শুনবে না। সে যেন কি রকম!'

'আচ্ছা, আমি বলছি।' বলে ভেতরে গিয়ে চাকরকে ডেকে জিগ্যেস করলাম—'এরা সব কারা রে?'

'পাড়ার লোক। রোজ খবরের কাগজ পড়তে আসে সকালে। অফিসের টাইম হলেই চলে যাবে।'

'তা একটু চা-টা করে দাও না ভদ্রলোকদের। দু-চার খানা করে বিস্কুটও দিয়ো থাকে যদি।'

মুখ বেঁকিয়ে সে চলে যায়—চা বানাতে।

দুপুরবেলা বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজখানা নিয়ে পড়তে গিয়ে দেখি, কাগজটা টুকরো টুকরো করে রেখে গেছে। সাতজনে মিলে পড়বার সুবিধে করতে কাগজখানা নয়-ছয় করে ফেলেছে, এখন তার ল্যাজা মুড়ো মিলিয়ে পড়া দুষ্কর। তবু জোড়াতাড়া দিয়ে পড়ার চেষ্টায় আছি, এমন সময়...এক পাল ছেলে এসে হানা দিল।

এসেই তারা আমার খাটের তলা থেকে তিনটে ক্যারম বোর্ড টেনে বার করল—সেখানে যে ওগুলো লুক্কায়িতভাবে ছিল তা আমি জানতাম না—বার করে আমাকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করেই খটাং খটাং করে ক্যারম পিটতে শুরু করে দিল সবাই।

ঘণ্টাখানেক পেটবার পর ওদের একজন বলল—ভারি খিদে পেয়েছে ভাই, বিস্কুটের টিনটা বার করতো।

বলতে না বলতেই ওদের একজন লাফিয়ে গিয়ে দেরাজের মাথা থেকে টিনটা পেড়ে আনল। সবাই মিলে ভাগাভাগি করে নিতেই টিনটা ফাঁকা।

'চকোলেটের বাক্সটা কোথায় আজ লুকিয়ে রেখেছে কে জানে।' বলে একটা ছেলে: 'লোকটা ভারি চালাক কিন্তু।'

খুঁজতে খুঁজতে বাক্সটা আমারই মাথার তলা থেকে বেরুলো। বালিশের নীচের থেকে। অথচ আমি বিন্দুবিসর্গও জানি না।

এতগুলো উপাদেয় চকোলেট আমারই সম্মুখ থেকে—আমার মুখের থেকে চলে যেতে দেখে দুঃখ হয়। মুখ ভার করে আমি তাকিয়ে থাকি।

একটি ছেলে আমার মনের কথাটি টের পেয়ে একটুকরো আমার হাতে তুলে দেয়—'খান না, আপনিও খান। খান একখানা।'

'তোমরা ইস্কুল যাও না?' আমি তাকে শুধাই। 'যাওনি কেন আজ?'

'বাঃ, ভ্যাকেশন যে? সামার ভ্যাকেশন তো। এখনো দেড় মাস ছুটি।'

'ও বাবা!' আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়।

চকোলেট-পর্ব সাঙ্গ হবার পর ক্যারম পেটা শেষ করে ফুটবল পিটতে তারা চলে যায়।

সন্ধ্যাবেলায় ড্রইংরুমে বসে আছি চুপচাপ, এমন সময় সকাল-বেলার ভদ্রলোকদের একজনের পুনরাবির্ভাব। তাঁর পিছু-পিছু আরেকজন।

'কতক্ষণ এসেছেন?' একজন শুধোলেন: 'রেডিয়োটা খোলেননি এখনো? ভদ্রলোক বাড়ি নেই বুঝি?'

'রেডিয়ো আমার দু কানের বিষ।' আমি জানাই।

'সেকি কথা। আজ একটা ভালো নাটক ছিল যে।' বলে তিনি নিজেই এগিয়ে গিয়ে রেডিয়োটা চালু করে দিলেন।

একে একে সবাই এলেন। আমাদের রেডিয়ো শুনতে।

'চাকরটা গেল কোথায়? তেষ্টা পেয়েছে বেজায়। এক গ্লাস জল পেলে হত।'

'বাজারে গেছে বোধ হয়।' বলে আমি নিজেই জল আনবার জন্য উঠতে যাচ্ছি, কিন্তু আর এক ব্যক্তি বলে উঠল—

'যাও না হে! ফ্রিজটা খুলে নাও না গিয়ে নিজে। বোতল বোতল ঠাণ্ডা জল ভর্তি রয়েছে। কতো খাবে?'

বলতেই পিপাসার্ত ভদ্রলোক উঠে গেলেন। সঙ্গে করে তিনি নিয়ে এলেন তিন বোতল জল, গোটা দশেক গেলাস এবং আরো কয়েক বোতল—তিনি প্রকাশ করলেন নিজেই—'এগুলোও ফ্রিজের ভেতর পেলাম। পাইন আপেল, অরেঞ্জ আর ম্যাংগো সিরাপ। এসো, শরবত করে খাওয়া যাক্। খাসা হবে। কতকগুলো বরফের টুকরোও এনেছি এই যে।'

গেলাস গেলাস বরফি-শরবত ঘুরতে লাগলো হাতে হাতে।

আমি ওদের একজনকে আড়ালে পেয়ে বললাম—'এতই যদি আপনার রেডিয়োর শখ, কিনতে পারেন ত একটা। ট্রানজিস্টার সেট, দাম আর কত! এমন বেশি নয়। তাহলে বাড়িতে বসেই শুনতে পারেন আরাম করে।'

'রেডিয়ো কিনে বাড়িতে বসে শুনব? বলেন কি আপনি?' তিনি বললেন। 'পাগল হয়েছেন? এখানে পাখার তলায় কুশানে বসে এমন আরামে···রেডিয়ো কিনি আর যত পাড়ার লোকেরা বাড়িতে এসে ভিড় জমাক! বাড়িতে রেডিয়ো রাখার ভারি ঝামেলা মশাই।'

ভদ্রমহোদয়রা বিদায় নিলে এক মাসের মাইনে আগাম দিয়ে চাকরকে আমি বিদায় দিলাম। তারপর নিশুত রাতে সদরে তালা দিয়ে বন্ধুর বাড়িকে তালাক দিয়ে উঠলাম এসে মেসে—নিজের বাসায়। পড়শীদের মায়া কাটিয়ে।

ব্যবসার আটঘাট

আগে আটঘাট বেঁধে তারপরে ব্যবসা—কথাটা আমার রামহরি কবিরাজের কাছে শোনা।

কবিরাজ মশায়ের সঙ্গে আমার বহুকালের পরিচয়। ওঁর কাছ থেকে একবার আমি একটা চুল-উঠার তেল নিয়েছিলাম—প্রথম পরিচয়েই আমাকে তাঁর সেই তৈলদান! সেই তেলের কাহিনী আপনাদের আমি বলেছি কিনা জানি না, কিন্তু সেই তৈলাক্ত পথ ধরেই আমাদের সৌহার্দ্য সুচারু হয়েছে। কবিরাজি তেল ব্যাভারের পর কবিরাজের ওপর অনেকের ভক্তি চটে যায়, কেবল চুলই যে চটচট করে বা পকেটই চোট খায় তাই নয়—বন্ধুত্বও চটকায়, কিন্তু আমাদের সম্পর্ক একটুও তেলচটা হয়নি।

সেই সময়ে কথায় কথায় যেমন তিনি আমায় আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিয়েছিলেন, এবারে দিলেন কামায়ুর্বেদ। কি করে ব্যবসায় পয়সা কামাতে হয় তার রহস্য ফাঁস করলেন।

'আটঘাট বেঁধে তবেই ব্যবসা, বুঝলেন মশাই?'—বলেছেন আমায় রামহরিবাবু: 'ব্যবসার আটটা ঘাট। আগে সেই ঘাটগুলো ঠিক করুন, বেঁধে ফেলুন ঘাটগুলো—আটদিক সামলে তারপরে তো ব্যবসায়ে বসবেন। আর বসাবেন দুহাতে।'

'একটা দিক সামলাতেই পারিনে, আটদিক সামলে বসতে পারলে তো অষ্টবসু হয়ে যাব মশাই! অত টাকা রাখব কোথায় আমি?' বলতে গেছি তাঁকে।

'কিসের ব্যবসা আপনার?' শুধিয়েছেন তিনি।

'আজ্ঞে কোনো ব্যবসা নয়। লিখি-টিখি। তবে মনে করলে কালিকলমের ব্যবসা বলতে পারেন।'

'বই লেখেন বুঝি ?'

'না, বই লিখি না। পুরো বই লেখা আমার দ্বারা হয় না। তবে ঐ ছড়ানো লেখাগুলোই পরে বই হয়ে বেরয়।'

'আপনি ছাপেন ?'

'আজ্ঞে না। অন্যলোকে ছাপে। প্রকাশক আছে তার', আমি জানাই।

'বই না লিখলেও বইয়ের ব্যবসা আমি বুঝি।' বলেছেন আমায় রামহরি কবিরাজ : তারও আটটা ঘাট আছে। যেমন তার এক ঘাটে আছেন আপনি, লেখক ; অপর ঘাটে আপনার পাঠকরা, ক্রেতারা। মাঝখানের এক ঘাটে প্রকাশক। আর এক ঘাটে বিক্রেতারা। তারপরে ছাপাখানা, কাগজওয়ালা, দপ্তরী, ডিজাইনার, ব্লক-মেকার, এরাও সব এক একটা ঘাট বইকি। এর সব ঘাট দিয়েই জলস্রোত বইছে, জলের মতন বয়ে যাচ্ছে টাকা। এর সব ঘাটগুলিতে বাঁধ দিয়ে সমস্ত জলটাকে যদি আপনি আটকাতে পারেন তাহলেই হবেন গিয়ে আপনি—'

'দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন। সংক্ষেপে ডি ভি-সি।' আমি বলি।

'তবেই আপনি হবেন যথার্থ ব্যবসাদার। নিজে বই লিখবেন, নিজের ছাপাখানায় ছাপা হবে, কাগজের দোকান থাকবে আপনার নিজের। বাঁধাইখানাও থাকবে আপনার। নিজের দোকানে বসে বেচবেন। তবেই না আটগুণ লাভ হবে ? বড়লোক হতে পারবেন আপনি। নইলে কেবল বই লিখে কি দুঃখ ঘুচবে ?'

'তাহলে তো আমায় কম্পোজার থেকে শুরু করে কম্পোজিটর পর্যন্ত হতে হয়। কেননা, এ ব্যবসার সব খাতেই উপায় আছে, কম্পোজিটরেরাও দু-চার পয়সা পায়—তাই বা কেন বেহাত হতে দিই ?'

'তাহলে তো আরো ভালো। অষ্টবসুর থেকে নবগ্রহ হয়ে দাঁড়ালেন তাহলে।'

'কিন্তু অতো টাকা নিয়ে আমি কী করব?' আমার সেই এক কথা। প্রথম প্রশ্নই শেষ প্রশ্ন।

অবান্তর কথায় কান দেওয়া বাহুল্য বোধ করে কবিরাজ মশাই। বলতে থাকেন—'আমার কবরেজিরও আটটা ঘাট আছে। তার সবগুলি বেঁধেই আমি ব্যবসা করতে বসেছি।'

'সেকি মশাই!' শুনে আমি অবাক্ হই: 'আপনাকে তো আমি এই একটা ঘাটেই দেখতে পাই। দিন-রাত্তির এখান দিয়েই যাই তো? এখানেই দেখি আপনাকে সব সময়। বরাবর।'

'আমার ভাইদের বসিয়ে দিয়েছি সব আর আর ঘাটে। আমার ওষুধের গাছ-গাছড়া আমি বাজার থেকে কিনি না। তার জন্য আমার বাগান আছে, সেখানে সে-সব উৎপন্ন হয়। সেখানে আমার এক ভাই থাকে। তারপরে কলকাতার উত্তর-দক্ষিণে দুখানা ওষুধ বিক্রির দোকান আছে আমার. সেখানে আমার দু'ভাই। এখানে এক ঘাটে আছি। অপর ঘাটে আমার রোগীরা। এখানে আমার এক ভাই ওষুধ তৈরি করে—তাকে আমার কম্পাউণ্ডার বলতে পারেন। অন্য লোককে কম্পাউণ্ডার রেখে বেতন দিয়ে কেন আমার পয়সা বরবাদ করব?'

'সাত ঘাট বাঁধা পড়ল।' আমি বললাম। আঙুলে গুণে গুণে যাচ্ছিলাম আমি।

'আর অষ্টম ঘাটে—আমার এই অষ্টম ভ্রাতা। শ্রীমান শ্যামহরি —এই আপনার সামনেই বসে আছেন।'

আমার নমস্কারের জবাবে শ্যামহরিবাবু বিনীত নমস্কার করেন।

'আপনার কোন্ ঘাট শ্যামহরিবাবু?' আমি শুধোই।

'আমার ঘাট—আমার—আমার'···তিনি একটু আমতা আমতা করেন।

হয়তো উনি নার্সের দিকটা সামলান, সেই কারণে অপ্রস্তুত হয়েছেন ভেবে আমি নিজেই সামলে নিই। কেমন যেন ঘাট হয়ে গেছে—এমনি একটা অপ্রতিভ ভাব দেখা যায় ওঁর মুখে।

কিন্তু আমার শেষ প্রশ্ন থেকেই যায়—'অতো টাকা নিয়ে আমি কী করব?'

'কেন, ওষুধ খান।' বলেন কবিরাজ মশাইঃ 'আয়ুর্বেদোক্ত শাস্ত্রীয় ওষুধ খান সব। আপনার স্বাস্থ্য শক্তি পরমায়ু অটুট থাকবে। বাড়বে আরো, নিজেকে বাঁচান। শাস্ত্রে বলেছে—আত্মানম্ সততং রক্ষেৎ ধনৈরপি দারৈরপি। বেঁচে টাকা খরচ করুন। আর টাকা খরচ করে বাঁচুন।'

'আত্মা অজর অমর, তার জন্য আমার চিন্তা নেই। কিন্তু আমার ভাবনা হয়েছে চুল নিয়ে। চুলগুলি অধুনা বড় ক্ষণভঙ্গুর হয়েছে। আঁচড়াতে গেলেই এত চুল উঠে যায় রোজ যে কী বলব। চুলের এই আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে আছি খুব, এর কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন?'

কেননা টাকার মত ওটাও আমার আরেক সমস্যা—টাক নিয়ে আমি কী করব?

'ব্যবস্থা আছে বইকি। শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। আয়ুর্বেদোক্ত মহাভৃঙ্গরাজ মাখুন, টাক আপনার পড়বে না।'

'যে-সব চুল পড়ে গেছে সে-সব উঠবে আবার?'

'আরো ঘন হয়ে উঠবে। এই নিন।'

চার টাকা দিয়ে এক শিশি মহাভৃঙ্গরাজ কিনে বাড়ি ফিরলাম। শুরু করলাম মহাভৃঙ্গরাজ। এবং সত্যি বলতে কি, কবিরাজ মশায়ের

কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলল। চুল উঠল। উঠতে লাগল চুল। ঘন ঘন গোছায় গোছায় উঠতে লাগল। টাক পড়বার মত অবস্থা দেখা দিল ক'দিনেই।

বন্ধ করে দিলাম তেলমাখা। কবিরাজ মশায়ের ঘাট দিয়ে আর হাঁটি না। বর্তমান যা রইলো সেই চুল বর্তে থাকলেই বেঁচে যাই।

কিন্তু এই তেল নিয়ে এখন কী করি, এই হল আমার সমস্যা। গোটা শিশিটাই পড়ে আছে, কয়েক চামচ তার মেখেছি মাত্র। চার চারটা টাকা গচ্চা গেছে। মনটা ছটফট করে, কাকে এখন গছানো যায় এটা ?

আমার এক বন্ধুর কথা মনে পড়ল। বাতে শয্যাশায়ী, উঠতে পারে না। পায়ে বাত। তার ওপর চলতে-ফিরতে হলেই মাথায় বজ্রাঘাত

তার কাছে গিয়ে আয়ুর্বেদের গুণকীর্তন করলাম। বললাম, 'ভাই, সব তো করলে, এবার একটু কবরেজি করাও! একটা বাতের তেল কিনে মালিশ করে ছ্যাখো দিনকতক। সেরে যাবে নির্ঘাৎ।'

'সত্যি বলছো ?' বিছানায় শুয়ে সে অবিশ্বাসীর হাসি হাসে।

'আরে আমারই হয়েছিল তো। মাজায় বাত। রামহরি কবরেজের তেল মালিশ করে মার্জিত হলাম, ভালো হলাম।'

'বলো কি হে ?'

'তবে আর বলছি কি! কবিরাজিতে তিনটে জিনিস আছে, বায়ু পিত্ত কফ। কোন্‌টা কী, তা আমি বলতে পারব না। তবে বাতের বিষয়ে তোমাকে বাতলাতে পারি। ভুক্তভোগী তো। বাত এসে প্রথমে গোড়ালিতে ধরে, পায়ে পড়ে বলতে পারো। তারপরে পায়ে ধরে—যেমন তোমার পায়ে ধরেছে। পায়ের গাঁট ছাড়িয়ে

তারপর কোমর। এইভাবে গোড়ালির থেকে আগাতে আগাতে চিৎপাত করে ফ্যালে। যাকে বলে বাতচিৎ করে, বুঝলে কিছু ?'

'কিছু কিছু।' সে বলে: 'শুয়ে শুয়েই তো বুঝছি।'

'আমি কবরেজ মশায়ের একটা তেল এনে দেব। হাতে হাতে ফল পাবে, পায়ে পায়ে টের পাবে তার। বায়ু প্রকোপিত হলেই বাত হয়।'

'বায়ুর সঙ্গে বাতের কি ? বায়ু প্রকোপিত হলে তো ঝড় হবে।'

'ধুত্তোর! যাকে বলে বায়ু তাকেই বলে বাত। বায়ু প্রকোপিত হলে ঝড় হতে পারে, সাইক্লোন হতে পারে, শিলাবৃষ্টি হতে পারে কিন্তু সংস্কৃত হলে বিশুদ্ধ বাত হয়। বাত ছাড়া আর কিছুই হয় না। বাতাহত কদলীবৃক্ষ বলে থাকে শোনোনি ? বাত হলে সেই কদলীবৃক্ষের মত ধরাশায়ী হতে হয়। যেমন তুমি হয়েছ।'

দৃষ্টান্তের দ্বারা আমার ব্যাখ্যা আরো বিশদ করে দিই।

আমার বন্ধু আটটা টাকা আমার হাতে দেন—তেলের জন্যে। মহাভৃঙ্গরাজের একটা গতি হয়—বৃহৎ বাতারি তৈল হয়ে যায়।

মাসখানেক বাদে ভয়ে ভয়ে বন্ধুর বাড়ি গেছি। বন্ধুর ছোট ছেলেটি নেমে এসে বলল—'কাকাবাবু, আপনি বোটুকখানায় বসুন। বাবা এখুনি নামবেন।'

'নামবেন! সে কি হে!' আমি তো শুনে অবাক্!—'তাকে কি আর ধরে নামাতে হয় না ?'

'না তো। আপনি যে বাতের তেল দিয়ে গেছলেন—সেই শিশিটা মালিশ করেই বাবা সেরে গেছেন একেবারে। এখন দিব্যি উঠে হেঁটে বেড়ান। বাবা এখন কামাচ্ছেন কিনা! কামানো শেষ হলেই নামবেন।'

বৈঠকখানায় বসে আছি তো বসেই আছি, এক ঘণ্টার ওপর

হয়ে গেল বন্ধুবরের আর নামা নেই। কামানো আর শেষ হয় না! মোটা-সোটা দেখে লাঠির খোঁজ করছে নাকি?

ইতিমধ্যে বাড়ির ভেতর থেকে চা জলখাবার এল। না চাইতেই খবরের কাগজ এসে গেল। আমি বসেই আছি।

দু ঘণ্টা বাদে নামল আমার বন্ধু। হাসতে হাসতে।

'কামাতে এতক্ষণ লাগে মানুষের?' আমি বিরক্ত হয়ে বলি।—'এইটুকুন তো গাল, তাতে কত আর দাড়ি গজায়! তারই নাগাল পেতে তোমার দু ঘণ্টা লাগে।' আমার গালাগাল দিতে ইচ্ছা করে।

'দাড়ি নয় ভাই, পা! পা কামাচ্ছিলাম। তোমার সেই তেলটা মেখে বাত নির্মূল হল বটে, কিন্তু চুল গজিয়ে গেল গোটা পায়। গোছা গোছা চুল। না না, লোম নয় রোম নয়, কেশ। কেশ কলাপ।'

শুনে আমার রোমাঞ্চ হয়।—'সে কি হে?'

'রোম তো একটুখানি বাড়ে, তারপর আর বাড়ে না, কিন্তু চুল বেড়েই চলে। বাড়তেই থাকে। লোমে আর চুলে এই তফাত। মাসখানেক তো বিছানায় শুয়ে তোমার তেল লাগালাম, বাত তো সারলো কিন্তু বিছানা ছাড়ার পর উঠে দেখি আগুল্‌ফ-চুম্বিত চুল—দুই পায়ে—আপাদ কোমর। চুল চুল শুধু চুল—আগাপাছতলা ইয়া ইয়া চুল।'

'কী সর্বনাশ!'

'সর্বনাশ আবার কি। চুল তো বাতের মতন তেমন কষ্টদায়ক কিছু নয়। বাত তো শুইয়ে দেয়। আর এ? কামালেই কমে যায়। আমি রোজ কামাই। দাড়ি কামাবার পর পায়ে ক্ষুর চালাই। নিয়মিতভাবে প্রত্যহ। দিব্যি আছি!'

আয়ুর্বেদের মহিমায় বিস্মিত হয়ে বাড়ি ফিরলাম। একটা

অনুশোচনার ভারও নেমে গেল অন্তর থেকে। বন্ধুকে ঠকিয়ে আট আটটা টাকা বাগিয়েছিলাম—অবশ্য বন্ধুকে বন্ধু না ঠকাইলে কে ঠকাইবে?—তারপর থেকে মনটা ভার হয়ে ছিল। আটটা টাকা বাঁধতে গিয়ে যে ঘাট করেছিলাম—ব্যবসার আমার প্রথম আট-ঘাট! সেটা চুলচেরা বিচারে বন্ধুর পক্ষে কিঞ্চিৎ কষ্টকর হলেও অষ্টরম্ভা হয়নি একেবারে। বন্ধুকে কলা দেখানো হয়নি। আমার দিক থেকে তেলটার কাটতি হলেও বন্ধুর দিকে কোনই ঘাটতি হয়নি।

তারপরে আমার এক খুড়ো মারা গেলেন। ডাক্তার বদ্যির কিছু কসুর হয়নি। কবিরাজ রামহরি দেবশর্মাও দেখেছিলেন শেষ পর্যন্ত, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তিনি দেহ রাখলেন শেষটায়।

খুড়োর মৃতদেহ নিয়ে গঙ্গাযাত্রায় বেরিয়ে পড়েছি···

পথে শ্যামহরিবাবুর সঙ্গে দেখা। রামহরির ভাই শ্যামহরি। তিনিও আমাদের সঙ্গ ধরলেন।

বল হরি হরি বোল, বল হরি হরি বোল—চেঁচাতে চেঁচাতে চললেন শ্যামহরি, তাঁর উৎসাহই সবচেয়ে বেশি।

'বলুন। চুপ করে আছেন কেন? বলতে হয়।' তিনি উসকে দেন আমায়।

আমি কিন্তু তেমন চেঁচাতে পারি না। লজ্জায় অধোমুখে চলি। আমার হরি বোল বলা হল না!

নিমতলার ঘাটে শ্যামহরি বললেন—'আপনাদের কাঠ চাই তো? মড়া পোড়াতে কাঠ লাগবে না?'

'তা তো লাগবে কিন্তু পাই কোথায় বলুন তো?'

'আমার দোকানে আসুন, পাবেন যত কাঠ আপনাদের দরকার। এখানেই আমার দোকান।'

শ্যামহরিবাবুর দোকানে গেলাম—সেখানে থরে থরে কাঠ সাজানো। চন্দন কাষ্ঠ থেকে শুরু করে আজে-বাজে কাঠ অব্দি।

'আপনি এখানে কাঠের দোকান খুলেছেন?' আমি তো হতবাক্।

'হাঁ মশাই। দাদা ওধার থেকে মাল সাপ্লাই করেন, আমি এখান থেকে কাঠ যোগাই।' তিনি জানান : 'হাঁ, আমার কারবার এই নিমতলা ঘাটেই।'

এতক্ষণে আমার চোখে পড়ে, রামহরিবাবুর ব্যবসার অষ্টম ঘাট সেইখানেই।

পুরস্কার-লাভ

জমজমাট সভা। মহকুমার ছোট-বড়ো সবাই জড়ো। ক্ষুদ্র-মহৎ সকলেই জমায়েত। ইতর-ভদ্রের কেউ বাকি নেই।

পিণ্টুও এসেছে। বেশ সেজেগুজেই। ধোপদুরস্ত হাফ্-প্যাণ্ট, হাফ্-শার্ট—ঝক্‌ঝক্ করছে জুতোর বার্নিশ, চক্‌চকে ব্যাকব্রাশ মাথার চুল।

জ্বল্‌জ্বল্ করছে বুকের ওপর টাটকা-পাওয়া সোনার মেডেলটা। রূপোলী গোলকের ওপর সোনালী পাত-মোড়া, মীনার কাজ করা— তার বীরত্বের পুরস্কার।

মহকুমা শহরের ইস্কুল প্রাঙ্গণে সভা। রীতিমত বিরাট সভাই বলতে হয়। তিনটে ইস্কুলের যতো ছেলেমেয়ে ভিড় করেছে। আর তাদের গার্জেনরা। অনাহূত রবাহূত জমেছে আরো কতো যে!

কলকাতার দৈনিকপত্রগুলির নিজস্ব সংবাদদাতারাও রয়েছেন। খবর পাঠাবেন নিজেদের কাগজে। পিণ্টু যে ইস্কুলের ছাত্র তার হেড-মাস্টার মশাই হয়েছেন সভাপতি। পিণ্টুর গর্বে তাঁর দেড় হাত ছাতি দশ হাত হয়ে উঠেছে। মহকুমার হাকিম সভার প্রধান অতিথি।

আর, চারিধার ঘিরে খালি দর্শক আর দর্শিকা।

প্রধান দ্রষ্টব্য হচ্ছে পিণ্টু।

সবাই দেখছে পিণ্টুকে। পিণ্টু কিন্তু কোনো দিকে তাকাচ্ছে না। মেডেল পেয়েও মোটে সে খুশী নয়। তাকে নিয়ে এই যে হৈ-হাল্লা, এত যে সোরগোল তাতে যেন তার সাড়া নেই। সে যেন এ উৎসবের কেউ না। এইসব আদিখ্যেতার বাইরে। নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ, নির্বিকার, ভার-ভার মুখ তার।

এমন দিনক্ষণে তাকে বেশ হাসিখুশিই দেখবে আশা করেছিল সবাই। ফুটন্ত ফুলের মতই প্রফুল্ল দেখা যাবে। অবশ্যি, ফুল যেমন ফোটে তেমনি আবার আলপিনও তো! কেউ আলগোছে তাকে পিন ফোটাচ্ছে এমনিতরো পিণ্টুর মুখখানা।

সভার যিনি ঘোষক, তিনি মাইকটা এনে খাড়া করলেন তার সামনে—

"এইবার আমরা আশা করি শ্রীমান পিণ্টু নিজমুখে, তার নিজের ভাষায়, সেই অসম সাহসিকতার কাহিনী আমাদের শোনাবে⋯"

সবাই চুপ। সমস্ত সভা নিস্তব্ধ। একটা পেন্‌সিল পড়লেও শোনা যায়। যে রোমাঞ্চকর দুঃসাহস কেবল বইয়ের পাতাতেই পড়া, তা এবার কানের পাতে পরিবেশিত হবে—উদ্‌গ্রীব সকলেই। কিন্তু শ্রীমান পিণ্টুর শ্রীমুখ থেকে একটা কথাও শোনা গেল না।

মাইকওয়ালা আবার নিজেই শুরু করলো গাইতে—"ক্লাস এইট-এর ছেলে, এই পিণ্টু—এই যে আপনাদের সামনেই দাঁড়িয়ে। কতোই বা বড়ো হবে আর? বছর বারো কি তেরো, বড়ো জোর ওর বয়েস। ইস্কুলের কাছের ছোট্ট মনোহারী দোকানে সেদিন যখন আগুন লাগলো, সবাইকে ঠেলে একাই সে গেল এগিয়ে। থামলো না বাধায়, মানলো না কারো মানা, জ্বলন্ত চালাঘরের মধ্যে ছুটে গিয়ে সেঁধুলো। দোকানদারকে টেনে নিয়ে এলো একলাই, এক হাতে, অবলীলায়। ধোঁয়া আর আগুনের ভেতর থেকে তার অচেতন দেহখানাকে একাই সে বার করে আনলো—বাঁচালো তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে⋯"

সভাশুদ্ধ হাততালি দিয়ে উঠলো সবাই—সাধুবাদ চারধারে। কিন্তু পিণ্টুর কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না।

"এইটুকুন ছেলের মধ্যে এমন বীরত্ব যেমন অভাবিত, তেমনি

অভাবনীয়—এক কথায় অভূতপূর্ব। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী এবং ছাত্রবৃন্দ! শ্রীমান পিণ্টুর মুখেই এখন শুনবো আমরা সেদিনকার কাহিনী। এখনই শুনতে পাবো।…পিণ্টু, তোমার সেই অগ্নি-অভিযানের কাহিনী—সেই জ্বলন্ত অভিজ্ঞতার কথা আমাদের কাছে তুমি বর্ণনা করো। তোমার নিজের ভাষায় ছু-চার কথায় বলো আমাদের…"

"ও আর এমন কী! ও কিছু না।" পিণ্টু একটু ইতস্তত করে বলে। সমস্ত কীর্তিটাকেই যেন এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়।

"কিছু নয়! তুমি বলো কি হে পিণ্টু?" মাইকওয়ালা বিস্ময় মানেন—"দেখুন আপনারা, এইটুকু ছেলের মধ্যে কতোখানি বিনয় —কি রকম সারল্য। তাকিয়ে দেখুন এত বড়ো কাজ করেও—এমন বীরোচিত বাহাত্নরির পরেও—এটাকে সে কিছু না বলে উড়িয়ে দিতে চাইছে। ভেবে দেখুন একবার, কতোখানি বীরত্বের পরাকাষ্ঠা হলে এমনটা হতে পারে।…"

বীরত্বের পরাকাষ্ঠা বলতে! যে পরাক্রমের একটু ইদিক-উদিক হলে—ইতরবিশেষ ঘটলে পরাকাষ্ঠার বদলে পোড়া কাঠ হয়ে বেরুতে হতো—সেই ব্যাপারটাকে সকলেই ভেবে ছাখে। যতই ছাখে ততই আরো ভাবিত হয়।

"এ আর এমন শক্ত কি! জলের মতই সোজা তো!" পিণ্টু জানায়—

"এসব কাজ একদম কিচ্ছু না।"

আগুনের মধ্যে ঢোকা—জলের মতই সহজ! বলে কি এ পিণ্টু? জলের পক্ষে সোজা হতে পারে, দমকলের পক্ষেও হয়তো, কিন্তু জলজ্যান্ত মানুষের বেলায় কথাটা খাটে কি? মাইকওয়ালা অতিকষ্টে নিজের বিস্ময় দমন করেন—

"হতে পারে তোমার কাছে এ কাজ তেমন কিছু নয়। তুমি বড় হয়ে আরো অনেক বড়ো কাজ করবে। আরো ঢের বেশি বীরত্ব

দেখাবে আমরা আশা করি। কিন্তু তাই বলে তোমার এই কাজটিও তেমন ফ্যাল্‌না নয়। তোমার এই আদর্শ—আত্মত্যাগের এই উজ্জ্বল উদাহরণ—আমাদের ছাত্র-বন্ধুদের সামনে দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে থাক। এখন, সেই অগ্নিগর্ভে প্রবেশ করবার আগে সেদিনকার তোমার মনের ভাব তখন কেমন হয়েছিলো সেই কথা তুমি বলো—"

মাইকটাকে তিনি ওর মুখের কাছে এগিয়ে দেন।

পিন্টু ঢোঁক গেলে। জিভ দিয়ে ঠোঁটটা চাটে একবার। কী বলবে ভেবে পায় না।

"যেমন ধরো, দোকানদারটাকে বাঁচাবার তোমার ইচ্ছে হোলো। কিন্তু কেন তোমার এমন ইচ্ছে জাগলো হঠাৎ?" শুরু করার ধরতাই হিসেবে কথাটা পিন্টুকে তিনি ধরিয়ে দিতে যান। উস্‌কে দিতে চান।

পিন্টু কিন্তু উস্‌কায় না। অনেক উস্‌খুস্‌ করে অবশেষে সে বলে—"ওর দোকানে অনেক—অনেক চকোলেট। বিস্তর খেয়েছি আমি। বেশ খেতে।" বলে নিজের ঠোঁট দুটো ভালো করে আরেকবার সে চেটে নেয়।

"বেশ তো। চকোলেট খেয়েছো, তার দামও দিয়েছো তেমনি। ধারে খাওনি নিশ্চয়, যে চকোলেটওয়ালার সেই ঋণ শোধ করবার মানসেই অগ্নিগর্ভে তুমি প্রাণ বিসর্জন দিতে গেছলে? তাকে বাঁচিয়ে তুমি তার যে উপকার করেছো সারা জীবন ধরে সহস্র চকোলেট ধারে খেলেও তার দাম ওঠে না। কী বলেন মশাই, ঠিক বলিনি?"

উদ্ধৃত দোকানদার অদূরেই বসে ছিলো। ঘাড় নেড়ে তার সায় দিলো, বলতে না বলতেই।

"পিন্টু সর্বদা নগদ দাম দেয় আমায়। ওর কাছে আমি এক পয়সাও পাইনে!" একথাও সে জানালো তার ওপর।

"কিন্তু পিণ্টু", মাইকওয়ালা উদ্ধারককে সম্বোধন করেন এবার, "গোটা দোকান যখন দাউ দাউ করে জ্বলছে তখন নিশ্চয় তুমি চকোলেট কিনতে যাওনি? চকোলেট দাও বলে তার মধ্যে ঢোকো নি তখন? দোকানদারকে বাঁচাবার জন্যেই গেছলে নিশ্চয়? তা, সেই আগুনের মধ্যে পা বাড়াতে কি তোমার একটুও ভয় করল না তখন?"

"ভয়, কেন কিসের ভয়? ভয়ের কী আছে?" পাল্‌টা তাঁকে প্রশ্ন হোলো পিণ্টুর: "আমি জানতুম আগুনের আঁচটুকুও আমার গায়ে লাগবে না।"

"জানতে? কি করে জানলে?"

"কি করে জানলুম? কেন, আপনি কি কোনো অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়েন নি নাকি?" ভদ্রলোকের অজ্ঞতা দেখে পিণ্টুকে অবাক্ হতে হয়।

"অ্যাডভেঞ্চারের বই!" মাইকওয়ালার দুই চোখে দ্বিগুণ বিস্ময়ের চিহ্ন দেখা যায়।

"বইয়েই তো? পড়েন নি কি, মোহন আগুনের মধ্যে ঢুকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো? অগ্নিশিখারা লক্‌লক্ করতে লাগলো চারপাশে, কিচ্ছুটি করতে পারলো না তার। অনর্থক দাউ দাউ করতে থাকলো, আজে-বাজেই, কোনো কাজে এলো না—তার কেশ স্পর্শও করতে পারল না।" বইয়ের শিকা থেকে লেলিহান শিখাদের পিণ্টু সভাস্থলে সবার সামনে টেনে আনে।

"ও, বই!" ভদ্রলোক ঢোঁক গেলেন—"সে-সব বইয়ের কথা! হ্যাঁ, বইয়ে ওইরকম লেখা থাকে বটে। তা, তুমি যখন ঢুকলে, নিজের প্রাণ হাতে করেই ঢুকলে, তখন কি তোমার একবারো মনে হয়নি যে, মাথার ওপরের জ্বলন্ত চালটা যে-কোনো মুহূর্তে তোমার ঘাড়ের ওপর ভেঙে পড়তে পারে?"

"সেজন্যে তো আমি তৈরি ছিলাম।" পিণ্টু অকাতর—অকপট : "আমি জানতাম সেটা ভেঙে পড়বে। ঠিক সময়েই পড়বে। কিন্তু আমি বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত পড়বে না। আমার বেরুবার আগে নয়!"

"কি করে জানলে তুমি? অ্যাঁ?"

"বইয়ের থেকেই জানি। জ্বলন্ত চাল, যতই জ্বলুক—যতই দাউ দাউ করুক না—কক্ষনো ওরকম বেচাল করে না। করতে পারে না। উদ্ধারকারীর ঘাড়ের ওপর ভেঙে পড়ে না কক্ষনো,—ভুল করেও নয়। সব্বাই জানে একথা—আর, আপনি জানেন না?"

"যাক গে, চালের কথা থাক গে", বদ্-চালটাকে তিনি পালটান—সেকথা চাপা দেন : "আচ্ছা, তারপর তোমার আশেপাশে বাঁশগুলো সব ফাটতে লাগলো ফট্‌ফট্ করে? তাই নাকি?"

"ফাটবেই, জানা কথা। ওতে আমি একটুও ভড়কাই নি। কেন ঘাবড়াবো—বলুন তো? করুক না বাঁশরা ফট্‌ফট্! যতো খুশি ওদের। ওদের ফট্‌ফটানিতে কী আমার আসে-যায়? থোড়াই কেয়ার ওদের ফট্‌ফটানিকে। আমি আমার কাজ করবো।"

"আশ্চর্য!" মাইকওয়ালার মুখে কথা যোগায় না।—"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বড়ো হয়ে তুমি আরো ঢের বীরত্বের কাজ করবে। বেড়ে উঠে একদিন আমাদের জাতীয় বাহিনীর বীর সৈনিক হবে তুমি। কিংবা সেনাপতিই না কি, কে জানে। লড়ায়ে গিয়ে কামানের মুখে এগিয়ে কেড়ে নেবে শত্রুর ঘাঁটি। যুদ্ধক্ষেত্রের গোলাবর্ষণকে অগ্রাহ্য করে তোমার আহত বন্ধুদের কুড়িয়ে নিয়ে আসবে মৃত্যুর মুখ থেকে..."

এমনি আরো অনেক কিছুই তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পিণ্টু তাঁর কথায় কান দেয় না। মাঝখানে বাধা দিয়ে তাঁর পুঞ্জিত তুলনা এক বাত্যায় উড়িয়ে দেয়—"সে আর এমন কি শক্ত মশাই?

গোলাগুলী কি গায়ে লাগে নাকি কারো? কক্ষনো না। ওরা তো সব যতো কানের এ-পাশ ও-পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। খালি হিস্-হিস্ করে চলে যায়, জানেন না?" অবাক্ না হয়ে পারে না পিণ্টু: "কি আশ্চর্য, আপনি কি একটাও কোনো অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়েন নি?"

গুলী তো হজমি গুলী। গুড়ুম করাই তার কাজ কেবল। যেমন গর্জন তেমনি বর্ষণ হলেও ওরকম গোলাগুলী সে গুলে খেয়েছে কতো যে!

"হিস্-হিস্ করে হে? বলো কি?" ভদ্রলোকের সব যেন গুলিয়ে যায়। প্রচণ্ড গোলাগুলীদের এক কথায় গিলে ফ্যালা একটু কষ্টকর হলেও, কোনোরকমে তিনি হজম করেন। অগ্নিকাণ্ডের কথায় ফিরে আসেন ফের—"সেকথা যাক—এখন সেদিনের কথাই হোক। যখন তুমি দোকানদারকে বাঁচাবার জন্যে এগুলে—"

"আমি দোকানদারকে বাঁচাতে যাইনি মোটেই। আমি তার চাকোলেটদের বাঁচাতে গেছলুম।" পিণ্টু কবুল করে সাফ্।

"অ্যাঁ। চকোলেটদের? কী বল্লে?"

"হ্যাঁ। ভাবলাম, অতগুলো চকোলেট অমনি অমনি পুড়ে খাক হয়ে যাবে? মারা যাবে বেঘোরে? তাই—এই ফাঁকে যদি চারটে তাদের সরিয়ে ফেলা যায় মন্দ কি? চেষ্টা করে দেখাই যাক না।"

"বটে?...বটে বটে?...তারপর চকোলেটদের বাঁচাতে গিয়ে...?"

"দোকানে ঢুকে চকোলেটদের দেখতে পেলাম না। একটাকেও না। দেখলাম তার বদলে মূর্তিমান এই দোকানদারকে। একটা বাক্স আঁকড়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন ভদ্রলোক।

"তখন তুমি চকোলেটের কথা ভুলে গিয়ে তাঁকেই বাঁচাতে গেলে?"

"মোটেই না। বাক্সটা তার হাত থেকে ছাড়াতে গেলাম আগে। আমার মনে পড়লো, আগুনে তো মানুষ তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস-টাকেই আঁকড়ে ধরে। তাকেই সবার আগে বাঁচাতে চায়! বইয়েই পড়েছিলাম। চকোলেটের চেয়ে প্রিয় জিনিস আর কী আছে? এটা নিশ্চয়ই সেই চকোলেটের বাক্সই হবে। এই ভেবেই আমি—কিন্তু এমনি সে জাপ্‌টে ধরেছিলো বাক্সটা যে, কিছুতেই তার হাত থেকে ছাড়ানো যাচ্ছিল না। কোনোরকমেই সেটাকে বেহাত করতে পারলুম না। দু-চার ঘা লাগালুমও, বেশ জোরে জোরেই—কিন্তু লোকটার হুঁশ থাকলে তো। মার খেয়ে মানুষ অজ্ঞান হয়, আর ও কিনা অজ্ঞান হয়ে মার খেলো। চোরের মার খেলো পড়ে পড়ে। তবু সে তার বাক্স ছাড়লো না কিছুতেই। তখন বাধ্য হয়েই—"

"বাধ্য হয়ে কী করলে তুমি?"

"বাক্স-সমেত টেনে আনলাম ওকে। আনতে হোলো বাধ্য হয়েই, করবো কী? কান ধরে হিড়-হিড় করে টেনে আনলাম বাইরে…"

"কান ধরে? কান ধরে কেন?" মাইকওয়ালা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেন না—"কেন, লোকটার কী হাত-পা কিছু ছিল না?"

সভার সবাই উৎকর্ণ হয়। অদূরে-উপবিষ্ট দোকানদারটিও নিজের কান খাড়া করে।

সবার টান-করা কানের দিকে পিণ্টু নিজের বাক্যবাণ ত্যাগ করে—

"ছিলো। থাকবে না কেন? আমার হাতের কাছাকাছিই ছিলো। কিন্তু এমন রাগ হোলো আমার যে তার কান না মলে থাকতে পারলাম না। আর কান মলতে গিয়ে—তবে হ্যাঁ, ওর কান

ধরে না টেনে গোঁফ ধরেও আনা যেত বইকি! আর সেইটেই হোতো ঠিক। গোঁফ ধরে টান মারাই উচিত হোতো, উপযুক্ত শাস্তি হোতো লোকটার। কিন্তু অমন তাড়াহুড়ার মাথায় কি মাথার ঠিক থাকে? কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ, আমি কি ভাবতে পেরেছি তখন? অতো দিক খেয়ালই করিনি। সত্যি বলতে, ওর গোঁফের কথা একদম মনেই ছিল না আমার।" পিন্টুর এখন আপসোস হয়—"মনে থাকলে গোঁফ থাকতে কি কেউ কারো কান নিয়ে টানাটানি করে?"

"তারপর? লোকটাকে বাইরে আনবার পরে?"

"কোথায় চকোলেট! পিন্টুর গোমড়া-মুখে আরো বেশি গাঢ় গুমোট দেখা দেয়—"বাক্সের মধ্যে খালি টাকা আর পয়সা! নোটের তাড়া কেবল! চকোলেটের ছিটেফোঁটাও নেই।"

বীরত্বের চূড়া থেকে বিরক্তির চরমে ওঠে পিন্টু। ঢের হয়েছে, ঢের সয়েছে সে—আর নয়! এতক্ষণ ধরে এমনধারা আদিখ্যেতা বরদাস্ত করা যায় না। বিকৃতমুখে বুকের মেডেলটাকে খুলে নিয়ে অবহেলায় সে হাফ-প্যান্টের পকেটে গুঁজে ছায়। তারপরে বিড়ম্বিত মুখ তুলে বলে—

"এমন জানলে কি আমি এক পা এগুতাম?" মাইক দূরে সরিয়ে পিন্টু তখন একেবারে অমায়িক: "ধারে আধখানা লজেঞ্জুস্‌ও দেয় না, কে বাঁচাতে যেত ঐ হতভাগাকে?"

"আর···আর···", তারপরেও পিন্টুর আরো অনুযোগের থাকে—"বইয়ের সব কথাই কিছু ঠিক নয়। আগুন লাগলে মানুষ যে তার প্রাণের জিনিসটাকেই আঁকড়ে ধরবে তারো কোনো মানে নেই।"

ব্যক্তিত্ব কাকে বলে !

নন্দদুলাল হুড়মুড় করে ঢুকল রেস্তরাঁর মধ্যে—ওরই যেন রেস্তরাঁটা, ভাবখানা এমনি। হৃষ্টপুষ্ট চেহারা—যদিও হৃষ্টতার চেয়ে পুষ্টতার পরিমাণ বেশী, তাহলেও নন্দদুলালকে দেখলে অহমিকার জ্বলন্ত ছবি বলেই জ্ঞান হয়।

চেয়ারে সে বসতে না বসতেই বয় ছুটে এসেছে—'কি আনব বলুন হুজুর—'

'দেখি তোমাদের মেনু।' বয়ের হাত থেকে খাদ্য-তালিকাটা হাতে নিয়ে চোখ বুলিয়ে ঠোঁট চেটে নন্দদুলাল অর্ডার দিল : 'এগ চিপস্, মাটন চপ আর রোস্ট্ ফাউল—আজ কেবল এই।'

নন্দদুলাল আমার টেবিলেই এসে বসেছিল। ওর প্রাদুর্ভাবের মিনিট পনরো আগে আমি এসেছি। কিন্তু এতক্ষণ ধরে বসে বহু চেষ্টাতেও ঐ বয়ের সুনজরে পড়তে পারি নি। ইশারা, ইঙ্গিত, হাতছানি সব ব্যর্থ হয়েছে। এমন কি কয়েকবার ঈষদুচ্চ স্বরে বয় বয় রবেও ও দূরে থাক্, ওর কৃপাকটাক্ষটুকুও টানা যায় নি—অথচ এই নন্দদুলাল হেলে-দুলে এসে বসতে না বসতেই তার একটা মুখের কথা খসবার আগেই শশব্যস্তে সে এসে হাজির! দেখে আমার তাক লাগতে থাকে।

তাক লাগলেও এ তাক আমি ফসকাতে দিই না। সত্যি বলতে প্রাণপণ ইচ্ছাশক্তির দ্বারাও বয়কে আনতে অপারগ হয়ে হতাশ মনে একটু আগে ভগবানের কাছে প্রার্থনা শুরু করেছিলাম—হে প্রভু, বয়কে আমার কাছে নিরাপদে পৌঁছে দাও। হয়তো আমার সেই প্রার্থনার দৌলতেই নন্দদুলাল এল—নিমিত্তরূপে এল

—আর নন্দদুলালের উপলক্ষ করে বয়রূপী বিধাতার তথাস্তু লাভ করলাম।

অতএব এই সুযোগ ফসকাতে না দিয়ে আমিও শুরু করি—'বয়, শোনো তো একবার এদিকে—'

'দাঁড়ান আসছি।' বলে বয় নন্দদুলালের অর্ডার নিয়ে ছুট দিল এবং চক্ষের পলকে রুটি আর মাখন এনে রেখে গেল আমার টেবিলে —নন্দদুলালের সামনে।

'শুনছো? আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে'—আমি আবার বলতে যাই।

'আসছি। একটু সবুর করুন।' বলে একটা প্লেটে তিনটে ডিমের পোচ্ আর কিছু আলুভাজা এনে সে হাজির করে। কাঁটা চামচ চালাবার সাথে সাথে নন্দদুলাল জানায়—'মাটন চপ আর রোস্ট্টাও চটপট নিয়ে এসো, বুঝেছ?'

বয় দ্বিরুক্তি না করে ঘাড় নেড়ে চলে যায়। আমার কথাটা ওকে বলার জন্য মুখ খুলেও ওকে বলা হয় না। বুক ফাটলেও আমার মুখ ফোটে না। অবশেষে ক্ষুণ্ণস্বরে নন্দদুলালকেই বলি— 'আমি প্রথম এসে বসেছি এই টেবিলে অথচ—'

নন্দদুলাল বাধা দিয়ে বলে—'প্রথম পুরুষই কিছু উত্তম পুরুষ হয় না। তুমি হচ্ছো তুমি, আমি হচ্ছি আমি। ব্যাকরণ পড়ে থাকলে এটা তো মানো?'

বয় টেবিলের উপর মাটন চপ আর ফাউল রোস্ট্ এনে রাখে। আমার ইচ্ছে করে উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ—আমাদের মাঝখানের ওই বয়—ওদের দুজনকে ধরে মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি বাধিয়ে পৌরুষের একটা উত্তম-মধ্যম রচনা করে বসি। কিন্তু মনের জ্বালা পেটের আগুনে জ্বলন্ত হয়ে কব্জিতে এসে পৌঁছবার আগেই

নন্দদুলালের মুখ থেকে খসেছে—'কফি লাও!' আর বয়ও অমনি উধাও—বলতে না বলতেই।

রেস্তরাঁ ছাড়া কোথায় বা খাই? কিন্তু চিরকাল ধরে দেখে আসছি রেস্তরাঁর এই বয়গুলো আমাকে যেন দেখতেই পায় না। আমলই দেয় না আমায়। সবার হুকুম তামিল করে সুদূর নক্ষত্রের আলোর মতন সব শেষে আমার কাছে এসে পৌঁছয়। আমার দুঃখের কথাটা নন্দদুলালকে জানাই।

শুনে ও অনুকম্পার হাসি হাসে—'নিজেকে জাহির করতে জানা চাই হে। বুঝলে?'

'বুঝেছি। কিন্তু কি করে যে জাহির করব সেই হয়েছে আমার সমস্যা।' আমি ঘাড় নাড়ি—'মারামারি করতে তো আমি পারি নে। গায়ে আমার অতো জোর নেই, আর হাঁকডাকও আমার আসে না।'

'তোমার মুশকিলটা যে কোথায় আমি বুঝেছি। আসলে তোমার ব্যক্তিত্বের অভাব। ব্যক্তিত্ব বলতে যা বোঝায় তার এক ফোঁটাও নেই তোমার ঘটে। আর ব্যক্তিত্ব হচ্ছে এমনি যা আপনিই জাহির হয়। স্বভাবতই তা ব্যক্ত না হয়ে পারে না। কোন্ লোকটা ব্যক্তি আর কোন্ লোকটা নয়—তা দেখলেই টের পাওয়া যায়। সবাই, এমনকি রেস্তরাঁর বয়াটে বয়রাও তা ধরতে পারে। আর সেইরকম বুঝেই তারা ব্যবহার করে থাকে।'

কথাটা আমার বোঝার চেষ্টা আর ওর বোঝাই করার চেষ্টা।

'এই ব্যক্তিত্ব বস্তুটা হচ্ছে কারো সহজাত, জন্ম থেকেই পাওয়া, আবার কাউকে কাউকে চেষ্টার দ্বারা অর্জন করতে হয়। এই যেমন তুমি আর আমি। আমি ব্যক্তিত্ব নিয়েই জন্মেছি, তোমাকে কিন্তু

সাধনার দ্বারা এটা পেতে হবে।' জাজ্বল্যমান দুটি উদাহরণ সামনা-সামনি ও রাখে।

'অনেক ব্যক্তির সাধ্য-সাধনা করতে হয় জানি, এই যেমন এতক্ষণ ধরে এই রেস্তরাঁর বয়ের আমি করেছি—কিন্তু ব্যক্তিত্বের সাধনা আবার কি রকম? তার রহস্যটা শুনি?'

নন্দদুলাল বিজ্ঞের ন্যায় মুখখানা বানায়—কিন্তু ওকে ধড়িবাজের মত দেখাতে থাকে। 'আছে হে, আছে হে। রহস্য আছে বইকি।' ওর মুখটাই রহস্যময় হয়ে ওঠে।

নন্দদুলাল ফাউল রোস্টের সদ্ব্যবহার করে আর আমি রহস্যটা যে কী হতে পারে তাই নিয়ে মাথা ঘামাই।

'বয়, বিল আনো।' কফির পেয়ালায় আরামের চুমুক দিতে দিতে ও বলে।

বয় একটা প্লেটে করে বিল নিয়ে আসে এবং এতক্ষণ পরে, একটু যেন দয়াপরবশ হয়েই, আমার দিকে ফিরে তাকায়। 'আপনার কী আনবো বলুন তো?'

বয়ের অযাচিত সম্ভাষণে আমি চমকে যাই—'আমার? আমাকে বলছো? আমার কী আনবে?·· এক কাপ কফি আর কিছু কাজু বাদাম—এই নিয়ে এসো। বেশী কিছু নয়।'

বয় আমার জন্য আনতে যায়। নন্দদুলাল বিলের দামটা প্লেটের উপরে রাখে আর একটা সিকি—ঐ বয়ের উদ্দেশেই নিঃসন্দেহ, প্লেটের তলায় রেখে দেয়।

'আমার দাঁড়াবার সময় নেই—চলি আজ? কেমন? আরেক দিন কথা হবে। ব্যক্তিত্বটা তখন বুঝিয়ে দেবো তোমায়। আজ একটু তাড়া আছে আমার।' এই বলে দিগ্বিজয়ীর মত পদভরে রেস্তরাঁ কাঁপিয়ে ও চলে যায়। আমি ওর ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক হৃষ্টপুষ্ট

চেহারার দিকে চেয়ে থাকি—পুষ্টতার চেয়ে হৃষ্টতার মাত্রাই এখন বেশী বলেই মনে হয়। চেয়ে থাকি আর ব্যক্তিত্বের আসল রহস্যটা কী হতে পারে তাই নিয়ে মাথা ঘামাই।

মাথা ঘামালেই আমার মাথার ঘিলু গলতে থাকে। আর ঘিলু গললেই বুদ্ধি খোলে। আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্বের স্থূল রহস্যটা আমার কাছে খোলসা হয়ে আসে। খানিকটা ঘিলু ওরফে কপালের ঘাম রুমালে মুছে ফেলার পরে মূল কথাটা আমি বুঝতে পারি। 'ওঃ, এই ব্যাপার! ··আচ্ছা পরীক্ষা করেই দেখা যাক না!' এই বলে আমার কফিটুকু নিঃশেষ করে আমি উঠে পড়ি।

তার পরের দিন। ঐ রেস্তরাঁই। আমিও ঢুকেছি, বসেছি আমার টেবিলে, আর নন্দদুলালও এসে উপস্থিত হয়েছে প্রায় সেই মুহূর্তেই। তেমনি আনন্দে নিজেকে দুলিয়ে, নিজেকে জাহির করতে করতে সে হাজির।—'পেরেছো? পেরেছো আবিষ্কার করতে রহস্যটা?' আমার সামনে বসে পড়ে ও প্রশ্ন করে।

'কিসের রহস্য?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'ব্যক্তিত্ব হে, ব্যক্তিত্ব! সহজে হয় না, সাধনা করতে হয়।' মুরুব্বির মতো ওর মুখ।—'কি করে এই ব্যক্তিত্ব গজায় টের পেলে তার কিছু?'

'একটু একটু পেয়েছি বোধ হচ্ছে।' নিরীহের মতো বলি।

'বোয়!' নন্দদুলাল হাঁক ছাড়ে।

'আসছি দাঁড়ান।' বয়ের জবাব আসে।···এবং বলতে না বলতে খাদ্যতালিকা হাতে করে সে তটস্থ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তালিকাটা ওর হাতে না দিয়ে আমাকেই দেয়।

নন্দদুলালের গোল চোখ আরো গোলাকার হয়ে আসে—বিস্ময়ে আর ক্ষোভে ওর গলা থেকে কথা বেরয় না—বয়! বলে ও গর্জন করে।

কিন্তু ওই বয়-ধ্বনিতে বয় আজ টলে না। 'একটু সবুর করুন বাবু, এঁরটা আগে এনে দিই।' বলে আমার অর্ডার নিয়ে চলে যায়।

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি লোকটার?' নন্দদুলাল গজরাতে থাকে, রাগে আর বিস্ময়ে থই পায় না।

'ব্যক্তিত্বের রহস্যটা তুমি জানতে চাও? চাও তো বলো'—আরম্ভ করি আমি, 'জানাতে আমার কোন আপত্তি নেই—'

'থামো!...এসব আদিখ্যেতা আমার ভালো লাগে না। আমি চাই কাজ, তুরন্ত কাজ। আমি কাজের মানুষ, এরকম বাজে রেস্তরাঁয় বসে বসে নষ্ট করার মতো অতো সময় আমার নেই।' এই বলে উঠে পড়ে সে গটগট করে বেরিয়ে যায়।

ব্যক্তিত্ব জিনিসটা কখনোই হাসবার চীজ নয়; কিন্তু তা না হলেও ওর দিকে তাকিয়ে আমার কেমন হাসি পেতে থাকে। ব্যক্তিত্বের মোদ্দা কথাটা তখন আর আমার কাছে অবিদিত নেই। আসল কথাটা হচ্ছে, নন্দদুলাল গতকাল বয়ের উদ্দেশে নিজের প্লেটের তলায় যে সিকিটা রেখেছিল—সে চলে গেলে—

না, বয়ের উদ্দেশে নিবেদিত জিনিস মেরে দেব, অতোটা ছোটলোক আমি নই—অন্ততঃ এখনো হইনি।

বয়ের প্রাপ্য বয়ই পেয়েছে। কেবল ঐ সিকিটা ওর প্লেটের তলা থেকে তুলে এনে আমার প্লেটের তলায় রেখেছিলাম। হাত-ফেরতা হয়ে ঐ বয়ের হাতেই পৌঁছেছে, কিন্তু ওই সামান্য একটু ইতর-বিশেষের জন্যই, নন্দর অমন মারাত্মক ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও আজ ওর আগে আমার এই আনন্দ—এই বয়লাভে জয়লাভ!

উদ্ধার-লাভ

ভর-সন্ধ্যেয় ভয়ঙ্কর তর্কাতর্কি হয়ে গেল। মানুষ নিখুঁত হয় না তা ঠিক, কিন্তু তাই বলেই কি খুঁতখুঁতে হতে হবে? অন্ততঃ মেয়েমানুষের বেলা এর অন্যথা হলে এমন কিছু মনুষ্যত্বের হানি হয় বলে আমার মনে হয় না।

তর্ক বাধলো আবার একটা মেয়ের সাথেই। দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে যে বাড়িতে উঠেছিলাম সেই বাড়ির মেয়ে। মেয়েদের ব্যাপারে অবশ্যি আমি খুব সতর্ক থাকি, কিন্তু কতো আর নিজেকে সামলানো যায়?

আমারই বোনের বন্ধু। কিন্তু মোটেই বন্ধুর মত নয়, রীতিমত বন্ধুর। আসার সময় বিনি বলেছিল, সাবধান, কখনো যেন তর্ক করতে যেয়ো না। কথায় পারবে না রীণার সঙ্গে।

ভারি তার্কিক রীণা। প্রোফেসারেদর পর্যন্ত হারিয়ে দেয়। দেখলাম কথাটা ঠিক।

তর্ক উঠলো উদ্ধার-লাভের কথায়। পুরুষের সবল বাহু চিরদিনই নারীদের উদ্ধার করেছে, এই শুধু আমি বলেছি।

"হাসির কথা।" বলেছে রীণা। মুচকি হাসির মূর্চ্ছনার সঙ্গে মিশিয়ে।

"বলতে পারো বটে। কথাটা কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য।" আমি বলি।

"ভুল ইতিহাস।" বলেছে ও। "ইতিহাস তো পুরুষের লেখা, তাই। নইলে মেয়েরা রচনা করলে ওর ধারা অন্যরকম হোতো।"

"তোমার ভুল ধারণা রীণা।" আমি বললাম।

"ভেবে দেখলে দেখা যায়," সে জানায়ঃ "মেয়েরাই চিরকাল পুরুষদের উদ্ধার করে আসছে।......"

এই বলে উদাহরণস্বরূপ যে-দৃষ্টান্তগুলি সে দেখায়, সারাংশে তা এই যে, মেয়েরাই নাকি মা হয়ে আমাদের প্রথম উদ্ধার করেন—অজানার গর্ভ থেকে এই ধরিত্রীতে। তারপরে বোন হয়ে ভাই-ফোঁটার দিনে উদ্ধার করে কে? অবশেষে বিয়ে করলে, সেও একটা মেয়েকেই করতে হয় আবার! তখন তার বুদ্ধিবলে পদে পদে আমরা উদ্ধার পাই।

ও বাবা! মেয়েদের ভেতর এত রহস্য তা আমার জানা ছিল না!

"মেয়েরা কি কবিতা যে ছেলেদের দ্বারা উদ্ধৃত হবে?" রীণা ঘৃণাভরে তাকায়।

কবিতা? কে বলে? মেয়েরা কবিতার মত, কারো সেরূপ ধারণা থাকলে আমি তা পালটাতে বলব। কবিতা তো নয়ই, বরং কঠোর সমালোচনা।

কিন্তু জবাব দেব কি, জবাই হয়ে গেছি!

"পুরুষের সবল বাহু! বলতে হয় না আর!..." রীণা বলেঃ "আসুন তো, পাঞ্জা কষে দেখা যাক্ কতো সবল বাহু—দেখি একবার।" ও হাত বাড়ায়।

আমার পাঞ্জা, আছে কিনা আমার জানা নেই, ভয়ে আপনা থেকেই পাঞ্জাবির হাতার মধ্যে গুটিয়ে আসে। পাঞ্জা আমার কাছে অঙ্কের মতই, কষতে গেলেই আতঙ্ক।

রীণা হাসে—"তারপরে বাঙালী! বাঙালীরা আবার পুরুষ না কি? ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা যায়।"

তর্কে পরাস্ত হবার পর আস্ত থাকা যায় না। আমি ভেঙে পড়ি—পড়ি গিয়ে নিজের বিছানায়। রাত্রের খাওয়া সন্ধ্যের আগেই

ঢুকেছিল। এখন শোয়ার পালা। গাঢ় ঘুমের আঠা লাগিয়ে যদি নিজের ভাঙা টুকরোগুলো যদি জুড়তে পারি।

খাওয়ার পরেই তর্কটা ওঠে রোজ। অনেকটা ঢেঁকুরের মতই, দেখা গেছে! যে-কোনো ছুতো নিয়ে উঠে পড়ে।

রীণা আর রীণার বাবার মধ্যেই বাধে, আমি চুপ থাকি। অবাধে লড়তে দিই; ওঁদের ঠোকাঠুকির মধ্যে ঢুকিনে।

স্বভাবতঃই বাবার হার হয়। অবশ্যি, নিজগুণেই তিনি হারেন। কিন্তু হেরে গেলেই তেলে-বেগুনে হন। তখন রীণা চুপ করে যায়, বাবা রাগলে রীণা আর আগায় না।

আতিথ্যের যথোচিত মর্যাদা রাখা হচ্ছে না মনে করে আজ আমি বাবার পক্ষে সায় দিতে গেছি। বিনির সাবধানবাণীতে কান দিইনি। না দিয়ে এখন···যাক গে···আর ভাবব না, কসে ঘুম লাগানো যাক ··!

কূট-তর্কে হারতে পারি, কিন্তু ঘুমে চিরদিনই আমি অজেয়। সুরবাঁধা তানপুরার মতই ঘুমটি আমার সাধা। শুতে না শুতেই আমার নিষুতি, কিন্তু একি ? ঘুম এখনো আসে না কেন ? মাথা গরম, কান ভোঁ ভোঁ করছে, ঘুমের দেখা নেই! হোলো কি আমার আজ ?

নাঃ, ঘুম আসছে না। দেয়াল-ঘড়িটার টিক্ টিক্ শুনি—মিনিটের পর মিনিট কাটে ··না ঘুমিয়ে কাটে!

রাত্রে ঘুম হয় না বলে রীণার বাবা দুঃখ করছিলেন। কেন হয় না, বুঝলাম এখন। রীণার সঙ্গে তক্কাতক্কি করেই!

রীণার বাবাকে রোজ রাত্রে ঘুমের ওষুধ খেতে হয়, তবুও নাকি ঘুম তাঁর আসে না। কী সর্বনাশ! ভাবতেই—ঘুম তো আমার মাথায় উঠেছিলো, এখন কড়িকাঠে উঠল।

কড়িকাঠদের গুণি! কিন্তু ঘুমের দেখা পাইনে।

যাই, রীণার বাবার কাছ থেকে ঘুমের ওষুধ নিয়ে আসি গে। তিনি নিশ্চয় ঘুমোন নি এখনো। তাঁর তো জেগে থাকবারই কথা।

দরজায় টোকা মারতেই বাবা বেরিয়ে আসেন।…"একি, ঘুমোননি এখনো!"

"না, আসছে না ঘুম। দয়া করে যদি একটু ঘুমের ওষুধ দেন—"

"নিশ্চয় নিশ্চয়! দেব বইকি! কিন্তু গোড়াতেই ওষুধ খেয়ে ঘুমোনোর অভ্যেস করা কি ভালো? মাথাটা ধুয়ে ফেলে ছাখো না। শোবার আগে চান করলে ঘুম আসে।" এই বলে তিনি গোটাচারেক বড়ি ছান্ আমায়ঃ "আপনার পক্ষে একটাই ঢের। চান করার পর যদি দরকার বোধ করেন, তাহ'লে খাবেন।"

তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাথরুমে সেঁধুই। চান করে দেখা যাক না—ক্ষতি কি? শরীর ঠাণ্ডা হলে ঘুম আসবে! আপনিই আসবে।

জামা-কাপড় খুলে আলনায় রাখতে না রাখতেই শরীর ঠাণ্ডা! শীত করতে থাকে। পুরু টার্কিশ তোয়ালেটা সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিই, তোয়ালেজড়িত হয়ে বাথটবের ঈষদুষ্ণ জলে গিয়ে কাৎ হই।

ওই যাঃ! ভুল করে ঘুমের গুলি গিলে ফেলেছি কখন! দরকার হলে স্নানের পরে একটা খাবার কথা—স্নানের সঙ্গে চারটেই গুলিয়ে ফেলেছি। যাক গে, কী আর হবে? নেয়ে উঠে এখুনি তো বিছানায় গিয়ে পড়বো, ঘুমটা আরো একটু প্রগাঢ় হবে বইতো না!

ঘুমের ঘোরে যতই লেপ টানি, লেপ আর আসতে চায় না। এমন শীত করে যে—জমে যেন বরফ হয়ে গেছি। ঠাণ্ডার চোটে সাধের ঘুম চিড় খেয়ে গেল, জেগে দেখি, ওমা, একি, বরফ হয়ে গেছি—সত্যিই তো! লেপের জায়গায় আমার গায় বরফের প্রলেপ!

আমি বাথটবের মধ্যে শুয়ে। টবের জল জমে বরফ! হাওয়া খাওয়ার জন্য স্নানের আগে বাথরুমের জানালাটা একটু খুলেছিলাম—

সেটা এখনো তেমনই খোলাই। তার ভেতর দিয়ে ঘরে এসেছে হিমেল হাওয়া, আর আমি এধারে মালাই বরফ! আকাশের তারারা উঁকি-ঝুঁকি মারছে উন্মুক্ত জানালা দিয়ে। রাত এখন কতো কে জানে!

তেড়ে-ফুঁড়ে উঠে পড়ার চেষ্টা করি—কিন্তু চেষ্টা করতে গিয়ে দেখি অসম্ভব। স্নান করতে বসে এমনি জমে গেছি যে কোমর পর্যন্ত জমাট—পা নাড়াই তার সাধ্য নাই! পা থেকে তলপেট অবধি এঁটে বসেছে বরফের চাপড়া, তার চাপে এমন ঠাণ্ডা লাগছে যে কহতব্য নয়। তোয়ালে জড়িয়ে টবে নেমেছিলাম তাই একটু রক্ষে, নইলে বুঝি বরফের এই গাত্রদাহেই মারা যেতাম।

যাই হোক, এভাবে তো থাকা যায় না—উপায় একটা করতেই হয়। কিন্তু কি উপায় করব? কাৎ হয়ে থাকার খাতিরে, কেবল দু-পাই নয়, বাঁ হাতটাও বরফের মধ্যে পাথর। খালি ডান হাতখানা কি করে টবের বাইরে গিয়ে পড়েছিল—সেইটাই খোলা রয়েছে। নাড়াচাড়া যায়। কিন্তু এক হাতে কি এই তুষার সমাধির থেকে মুক্ত হতে পারব? ভাবতেই আমি কুলকুল করে ঘামতে থাকি, মনে মনে। বাইরে ঘামবো তার যো ছিল না, কুল্‌পি হয়ে গেছি যে!

ডান হাত বাড়িয়ে যদি গরম জলের কলটা খুলতে পারি যে কোনোরকমে, তা হলে বেঁচে যাই। কিন্তু তাও দেখলাম নাগালের বাইরে। এখন? এখন শুধু মুক্তকণ্ঠে ডাক ছাড়া যায়; গলা ছেড়ে কাঁদতেও পারি।

ডাকবো—কাকে? চাকরদের কেউ বাড়ির ভেতর থাকে না, থাকতে আছেন কেবল কর্তা আর সেই মেয়েটি। ভোরের দিকে হলে কর্তা এখন ঘুমের ঘোরেই—নিজের মারাত্মক গুলি খেয়ে। ডাক শুনলে মেয়েটিই ছুটে আসবে। এসে উদ্ধার করবে আমায়। তার

হাতে উদ্ধার-লাভ? ভাবতেই এমন খারাপ লাগে! যে-মেয়ে বাঙালীর ছেলেদের মানুষ বলে জ্ঞান করে না। বাঙালী হয়ে কোন্ মুখে—নাঃ, রীণার ঘৃণালাভ করেছি, সেও আমার ভালো, তাও শিরোধার্য, কিন্তু তার কাছে ঋণী হতে আমি নারাজ। ওর নিন্দাবাদ—তাও আমার সইবে, কিন্তু ওর হাতে জিন্দাবাদ—অসহ্য।

হাতের কাছে আল্‌নায় আমার কাপড় জামা ঝুলছিল। পাঞ্জাবির পকেটে সিগ্রেট-লাইটার রয়েছে, ওইটে দিয়ে বরফ চেঁছে নিজের চেষ্টায় মুক্ত হতে পারি হয়ত। একটু আশার আলো দেখা দেয়। যাকে রাখো সেই রাখে, কথাটা বলে মিথ্যে নয়। সিগ্রেট আমি খাইনে, তবু লাইটারটা রেখেছিলাম। আমার এক সিগ্রেটখোর বন্ধু ওটা উপহার দিয়েছিল আমাকে—আমার জন্মদিনে—'তোমার জীবন ধূমায়িত হোক'—এই কুভেচ্ছা করে। সিগ্রেট ধরাইনি কখনো, কিন্তু ওটাকে ধরিয়েছি হরদম্। যখন-তখন ফস্ করে জ্বালতে বেশ লাগে! যাই হোক, রেখেছিলাম বলেই তো আজও কাজ দিলো। রক্ষা করলো আমায়।

ডান হাত বাড়িয়ে লাইটারটা পকেট থেকে বার করি। কিন্তু বৃথাই আশা, সিগ্রেট-লাইটার শাবল নয়, আর আমিও তেমন সবল নই যে লাইটারের খোঁচায় বরফের চাঙাড় ভাঙব। এর নির্গলিত ক্ষীণ শিখায় যে এই তুষারস্তূপ গলানো যাবে তাও অসম্ভব।

সব আশাই নির্মূল—একটি বাদে। সে হচ্ছে মেয়েটির আসা। কিন্তু—কিন্তু—নাঃ, কিছুতেই না!

লাইটার জ্বালিয়ে সাবধানে আমার পাঞ্জাবির হাতায় আগুন লাগাই। পাঞ্জাবির থেকে আগুনের শিখা কাপড়ে গিয়ে ধরে।··· আগুন! আগুন!! আমি চেঁচাতে থাকি।

বরফে জমে থাকলে ডাকতে না পারি কাউকে, কিন্তু আগুন

লাগলে চেঁচানোই নিয়ম। আগুনের কানুনে—সাধারণ দস্তুর। আইনেও বলে—আগুন লাগলেই হাঁকবে—হেঁকে জানাবে সবাইকে।…আগুন আগুন আগুন !!!

দ্রুত পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় সিঁড়িতে। আসছে—মেয়েটিই !

বাথরুমের বাইরে থেকে সে ডাকে। সারা ঘর ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ভর্তি। তার এক ধাক্কায় বাথরুমের দরজা খুলে যায়। নাঃ, মেয়েটার বাহুতে বল আছে সত্যিই !

তারপর ? তারপর সে হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে বরফের পিঁজরা থেকে খালাস করে আমাকে। সারা গায়ে তোয়ালে জড়িয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমি উঠি। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াই।

বরফ আর জলের সাহায্যে চকিতের মধ্যে আগুন নিবিয়ে ফ্যালে সে—ধোঁয়া যা ছিলো জানলা দিয়ে হাওয়া হয়ে যায়।

"রী-রী-রী-রীণা, তো-তো তোমার ঋ-ঋণ আ-আমি ক-কখনো শুধতে পারব না।" আমি বলি। হাত-পা দাঁত সব আমার ঠক্ ঠক্ করছে তখন।

রীণা অবাক্ হয়ে তাকিয়ে।—"আপনি—আপনি কি রোজ শোবার আগে এমনি বরফে চান করেন নাকি ?"

তার চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি, কণ্ঠে বিস্ময়, বলার ভঙ্গিতে খাতির।

এতক্ষণে আমার সময় আসে—আমি সুযোগ পাই। জমাট হাত-পা খেলিয়ে নিয়ে বলি আমি : "হ্যাঁ। রোজ। কি শীত কি গ্রীষ্ম। দার্জিলিঙে তো বটেই ; এমন কি, কলকাতাতেও বাদ যায় না। রাত হয়েছে অনেক। যাও, শোওগে এখন।"

বিনির কাণ্ড

টিকিট কিনতে কিনতেই গেলাম! আজ জলসা, কাল কনসার্ট, পরশু মণিপুরী নৃত্য, তার পরদিন চ্যারিটি অভিনয়; এমনি একটা-না-একটা চলেছে তো চলেইছে, দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা, কামাই নেই, আর—(,)—কমাও নেই। আর এসবের টিকিট না কিনেই কি নিস্তার আছে?

টিকিট কিনতে কিনতেই ফতুর হয়ে গেলাম বলতে গেলে!

এক-আধটু লিখে-টিখে, এখান-সেখান থেকে, একান্ত চেষ্টা-চরিত্রে এক-আধ টাকার টিকি দেখতে পাচ্ছি, আর তা টিকিটেই সাবাড় হয়ে যাচ্ছে দেখতে না দেখতে!

পরের হিতকল্পে, অবিশ্যিই, ও-সব। চ্যারিটির কারবার—টাকাটা ঘরে বেঁধে কেউ নিয়ে যাচ্ছে না, ধরে-বেঁধে সাধলেও না! হয় কোনো সমিতি, নয় কোনো সঙ্ঘ, অথবা কোনো মিশন, বা কারোর কন্যাদায় কিংবা কোথাকার বন্যাদায়—এইসব ব্যাপারেই বলতে গেলে অপরের উপকার করবার উপলক্ষেই এইসব আদায়, তাছাড়া আর কিছু নয়!

নিজের অপকার করে পরের উপকার করা—এহেন উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আমার মতদ্বৈধ আছে। যে-সব বন্ধুরা চ্যারিটি টিকিট বেচতে আসেন, তাঁদের কথাই বলছি আমি—।

কিন্তু আমার অভিমতকে তাঁরা ধর্তব্যের মধ্যেই ধরেন না। স্পষ্টই বলে বসেন: "তোমার মতের আবার মূল্য কি হে? তোমার মতামতে কিছু যায়-আসে না।"

সত্যি আমার কথার কোনো অর্থ হয় না সেটা আমি বুঝি। কিন্তু অর্থ যায় সেইজন্যই ইতস্ততঃ করি।

"তা তো যায়-আসে না, কিন্তু টাকাটা যায় কিনা!—" আমতা আমতা করে বলি, তত্রাচ বলি।

"কিন্তু যাচ্ছে তো পরের জন্যই?—পরের উপকারের জন্যই? লোকে পরের জন্যে প্রাণ দ্যায়; দিয়ে ফেলে না কি? তুমি তো একটা টিকিট কিনছ কেবল! হয় পাঁচ টাকার, নয় দু' টাকার, নয় এক টাকার! বড় জোর না হয় একটা দশ টাকারই কিনবে; এর বেশী তো নয়?"

তা বটে!

এবং ভাবনার কথাই বটে! বড় জোর একটা দশ টাকারই কিনবো—তার বেশী তো আর না।

"আচ্ছা নিজেকে পর ভাবলে হয় না? ক্ষতি কি তাতে?" পকেটের মধ্যে মণিব্যাগ আঁকড়ে আমার সর্বশেষ প্রয়াস: "সেরকম ভাবলে, আমার টাকাটা—আই মীন—পরের টাকাটার আর বাজে খরচ হয় না। পরের জিনিস বরবাদ হতে দেওয়া কি ভালো? তুমিই বলো না?"

"নিজেকে পর ভাববে, তার মানে?" বন্ধুবর একটু বিস্মিতই হন।

"মানে, নিজেকে পর ভেবে নিজের উপকারই করে ফেললাম না হয়? পরকে আপনার ভাবতে দোষ কি? তাই তো দস্তুর।"

বন্ধু ভারি গোলমালে পড়ে যায়—"আপনার-পর এসব কী বকছ তুমি পাগলের মতো?"

পাগলের মতোই বটে। জানি সুদূরপরাহত, তবু পরের তরফে প্রাণপণে ওকালতি চালিয়ে যাই, নিজেকে বাঁচাতে।

"নিজের মতো পর কেউ আছে নাকি হে? অপরে মারা গেলে,

তবু আমরা কাঁদতে পাই, কাতর হয়ে পড়ি, শোকসভা করে থাকি—কিন্তু নিজের মৃত্যুশোক গায়েই লাগে না। নিজে মারা গেলে কোনো দুঃখই হয় না বলতে গেলে। তবে ?

কিন্তু যাবতীয় জটিলতা কাটিয়ে উঠবার অসীম ক্ষমতা আমার বন্ধুদের। উক্ত নিদারুণ দার্শনিক সমস্যাসমূহের ধার ঘেঁষেও তাঁরা যান না—কিংবা ধার ঘেঁষেই তাঁরা চলে যান—অবলীলাক্রমেই কেটে পড়েন বাস্তবিক !

"ওসব বাজে কথা রাখো ! টাকাটা বের করো দেখি, বাপু !" এক কথাতেই সমস্ত কথা সাফ করে ছান তাঁরা।

অগত্যা আত্মসম্বরণ করে মণিব্যাগের মুখ ফাঁক করতেই হয়। কিন্তু বন্ধুদের বেলা তবু রক্ষে ছিলো, কমপক্ষে এক টাকার কাটলেই কাটান ছিলো, তাই যা বাঁচোয়া, এবং পারলে, পালাতে পারলে, পালিয়েও পার পাওয়া যেতো, তাও কম কথা নয় ; কিন্তু মুশকিল হয়েছে আমাদের বিনিকে নিয়ে। বিনিও ঠিক না, বিনির কলেজের সহপাঠিনীরা—বিনি থেকেই যাদের সূত্রপাত, বিনি-সুতোয় যে-সব বিভিন্ন ফুল গাঁথা পড়েছে, তাদের নিয়েই বেধেছে ফ্যাসাদ !

তারাও আবার টিকিট গছাতে লেগে গেছে।

তাদের হাত থেকে রেহাই নেই। এমন ফ্যালফ্যাল করে চায়, আর ভ্যাল ভ্যাল করে হাসে—মুখের উপরেই হেসে ছায়—যে উচ্চ-বাচ্য না করে মুখটি বুজে কিনতে হয়। দ্বিতীয় ভাগের অদ্বিতীয় গোপালের ন্যায় সুবোধ বালকের মতোই।

পাঁচ-দশ টাকার নীচে নামবার যো কি ! বেশী দামেরটাই কিনে ফেলি।

বিনিকে তারা বলে : "কি করব বল ভাই ? দাদারা কোন কাজেরই না। দামী টিকিটগুলো বেচতেই পারে না তারা। এগুলো

নিয়ে আমাকেই তাই বেরুতে হয়েছে। এক টাকার--দু' টাকার—তাই কাটাতেই তাদের অস্থির কাণ্ড!"

দাদাদের সম্বন্ধে তাদের খেদোক্তি খুব খাঁটি বলেই মনে হয়।

"আমার দাদা কিন্তু টিকিট কিনতে ওস্তাদ!" বিনি বলে ওঠে: "চ্যারিটি একটা হোলেই হোলো। প্রায় ফসকায় না।"

দাদৃ-গর্বে বিনির বুক ফুলে ওঠে। আমি কিন্তু ভারি লজ্জিত হয়ে পড়ি।

"দাদা টিকিট কেনে আর আমি দেখি। আরো নতুন টিকিট পাস তো, আনিস আরো। বুঝলি?"

বুঝতে তাদের দেরি হয় না, ভয়ানক ঘাড় নেড়ে তারা চলে যায়।

ঘরে বোন থাকা, মানেই, দেখছি এখন, বনে ঘর থাকা। অর্থাৎ, যথারণ্যম্ তথা গৃহম্! অতএব অরণ্যে রোদন করে লাভ কী? নিজের বোন কি আর ভাইয়েব দুঃখ বুঝবে? পরের বোনরাই যখন বোঝে না!

কিন্তু ঘরে বাইরে এরকম আক্রমণ কাঁহাতক সওয়া যায়? ঘরোয়া বিভীষণের হাত থেকে, বহুত ভেবে, বাঁচবার একটা ফিকির বার করি। অবশেষে! আর কিছু না, বিনির বন্ধুদের যখন প্রাদুর্ভাবের সময়, সেই দুর্যোগে বাড়িতে না থাকা। সাধারণতঃ বিকেলের দিকটায়, কিংবা কলেজের ছুটি-ছাটা থাকলেই ওরা আসে—টিকিট কিংবা বিনা টিকিটেই এসে পড়ে—সেই ফাঁকটায় আমি রাস্তায় ঘুরে মরি। নেহাত অক্ষম হলে চিলেকোঠায় গিয়ে লুকিয়ে থাকি, বিনিরও অজান্তে।

কিন্তু রাস্তায় বেরিয়েও কি নিস্তার আছে? কোলকাতার পথঘাট ভূগোলের গোলমালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এমন অদ্ভুতভাবে তৈরী যে একবার পা বাড়িয়েছ কি যত চেনাশোনা লোকের সঙ্গে দেখা হতেও

শুরু করেছে। এবং অচেনা অল্প-চেনারাও খুব কসুর করছে না তা বলাই বাহুল্য! যাকে তোমার জরুরি দরকার এবং যাকে তোমার আদপেই কোনো প্রয়োজন নেই, তাদের দেখা পেতে হোলে কোলকাতার পথে বারেক বেরুলেই হোলো! এমন কি, যখন তাদের কারু দেখা না পাওয়াটাই বেশী দরকারী তখনো। সকলের মিলনের পক্ষে সুপ্রশস্ত, চলতি বৈঠকখানার সমতুল্য, কোলকাতার পথের সমকক্ষ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কিছু আছে কিনা সন্দেহ!

সত্যি, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি দেখতে পাবে, যাদের এককালে চিনতে, এখন প্রায় ভুলে এসেছ, যারা হয়তো কবে তোমার ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল, তারপর বহুদিনের ছাড়াছাড়ি; যাদের সঙ্গে সুদূর বিদেশে পরিচয়, প্রবাসের আলাপ, যারা তোমার এক জেলার বা যাদের সঙ্গে এক সময়ে এক জেলেই কাটিয়েছিলে—অথবা যাদের চেনই না, কোথাও একদা এক মিনিটের বাক্যবিনিময়—এমন কি, বারংবার বাড়ি চড়াও হয়ে হাঁকডাক দিয়েও যাদের পাত্তা পাওয়া যায় না, দেখতে পাবে, তাদের সবার সঙ্গে একে একে দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে যাচ্ছে।

এবং—এবং প্রায় সবার হাতেই কোন-না-কোন চ্যারিটির টিকিট!

অগত্যা, কি আর করি, রেগেমেগে একটা ছাপাখানাতে গিয়েই হাজির হলাম।

নিজেই শ'খানেক টিকিট ছাপাবো। ছাপিয়ে নেবো নিজের জন্যই। জানা গেলো, একশ'খানা ছাপাতেও যা খরচ, তিনশ'খানা ছাপাতেও তাই—তখন বেশী ছাপানোই সুবিধে। অতএব পাঁচ টাকা দামের কমলা রঙের ছাপালাম একশ', দুটাকিয়া লাল রঙের শ'খানেক, বাকিটা একটাকানে বাদামী।

আরো দামী আর ছাপালুম না, মেরে কেটে পাঁচ টাকা তক্ হয়তো

কাটাতে পারবো—বেশী দামের ছেপে কি হবে? তাছাড়া দশ টাকার টিকিট মেয়েরাই কেবল বেচতে পারে। আর—আর—আমি—আমি তো আর মেয়ে নই!

তিনশ' টিকিট ছ'খানা বইয়ে বাঁধিয়ে চমৎকার বানিয়ে বার করে দিলে তারা। সেই ছাপাখানাওয়ালারা।

রঙ-বেরঙা টিকিটগুলোর দিকে তাকাই, আর, পুলকে গুমরে গুমরে উঠি। পাতায় পাতায় ঝকঝকে হরফে জ্বলজ্বল করছে:

H. R. K. R.-এর

সাহায্যকল্পে

বিখ্যাত জাতিস্মর বালক

রামখেলন

তবলা বাজাইবেন এবং ধ্রুপদ গাইবেন

ষ্টার থিয়েটার—আগামী শনিবার

ব্যস্, আর আমাকে পায় কে! রাস্তায় বন্ধু-বান্ধব দেখলেই পাকড়াও করি; যে এককালে টিকিট গছিয়ে গেছে তাকেও। এবং যে কখনো সে দুষ্কর্ম করেনি তাকেও—কাউকে বাদ দিই না।

এবং যে পুনরায় নতুন টিকিট গছাতে এসেছে, তার বেলা তো কথাই নেই!—

"কিনবো বইকি ভাই! টিকিট না কিনলে হয়।"—দেখবা-মাত্রই বলতে শুরু করি: "চ্যারিটির ব্যাপার—কিনতে হবে বইকি! ক'খানা দেবে বলো তো? কতো দামের দিতে চাও? তার বদলে তত দামের এইচ্ আর কে আর-এর টিকিটগুলো দেবো তোমায়—এই বেচেই টাকাটা তুলে নিয়ো, কেমন?"

শোনবামাত্রই বন্ধুরা পেছোতে থাকেন: এই বলে বিক্রি করে

পেরে উঠছিনে। এর উপরে আবার ?" আঁতকে ওঠেন তাঁরা, আঁতে গিয়ে যেন ঘা লাগে তাঁদের !

"ক্ষতি কি ? একই কথা তো। টিকিট নিয়ে টাকা দিতাম, তার বদলে এই টিকিটগুলোই দিলাম না হয়। ঠিক তত দামের ততখানাই দেব—বেশী দিচ্ছি না তো। ভড়কাচ্ছ কেন ? খুব বেচতে পারবে এ ক'খানা !"

"না ভাই, পেরে উঠবো না ভাই !" তারা কাঁদো-কাঁদো হয়ে পড়ে ঃ "যা কাছে রয়েছে তার ধাক্কাই সামলাতে পারছি নে !"

"কী যে বলো ! তোমরা আবার পারবে না ! তোমরা না পারো কী ! তোমাদের আবার অসাধ্য আছে ? এ তো বোঝার উপর শাকের আঁটি। নাও, কতো দামের দেবো বলো ? দু' টাকা-এক টাকা—না পাঁচ টাকার ?"

সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুদের উৎসাহ কমতে থাকে। দেখতে দেখতে, কে যে কোন্ ফাঁকে কোথা দিয়ে সরে পড়ে টেরই পাওয়া যায় না। কিন্তু আমিও সহজ পাত্র নই। আরো সব বন্ধুদের বাড়ি গিয়ে চড়াও হই। ফলাও করে টিকিট বেচতে লেগে যাই।

কিন্তু কি আশ্চর্য, একাদিক্রমে বন্ধুদের সকলেই সমান বীতস্পৃহ, সম্পূর্ণ অপারগ, টিকিট কেনা সবার পক্ষেই সুদূরপরাহত। কারো বৌয়ের অসুখ, কারু বা ছেলেমেয়ে হেমেছে—হামাগুড়ি নয়, হামের গুড়ি দেখা দিয়েছে, কারো অন্য কোথাও ঠিক সেই দিনই নেমন্তন্ন, কেউ বা ছোট ছেলেপিলেদের থিয়েটারে নামানোর ঘোর বিরোধী, কোথাও বা রামখেলন বলেই যত আপত্তি, কারো ধ্রুপদ গানে আসক্তি নেই, বরং ভয়ই রয়েছে দস্তুরমতো, কোন বন্ধুর আবার তবলার বোল শুনলেই, তবলায় নয়, তার নিজের মাথাতেই কে যেন চাঁটাতে থাকে। ইত্যাদি, ইত্যাদি—।

একজন তো স্পষ্টই বলে বসল: "ওসব জন্মান্তরবাদে, ভাই, আমার বিশ্বাসই নেই। জাতিস্মর নয়, বজ্জাতিস্মর।"

আরেকজন বললেন: "এচ্ আর কে আর-এর উদ্দেশ্যের সঙ্গে আমার একদম কোনো সহানুভূতি নেই। ওদের আমি সাহায্য করতে একেবারে অক্ষম।"

"এইচ্ আর কে আর-এর উদ্দেশ্যের কিছু জানো তুমি?" আমি প্রশ্ন করি, বেশ একটু বিস্মিত হয়েই আমার প্রশ্ন।

"কে আর না জানে! সবাই জানে ওদের ব্যাপার! তুমিই কি আর জানো না? তুমিই বলো না?"

তা বটে! আমার তো অজানা থাকবার কথা নয়—আমিই যখন টিকিট-হস্তে বেরিয়েছি। আমাকে বলতে হয়: "না ভাই, তোমার ভুল ধারণা। ওদের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ জানো তো? কী সাংঘাতিক ব্যায়রাম! তাই সারানোর মতলবেই এই সমিতিটা খোলা হয়েছে। বুঝেছ? একটা নতুন পদ্ধতির চিকিৎসাকেন্দ্র—"

"জানি! জানি! আর বলতে হবে না। কে না জানে! কিন্তু ওসব ব্যামো আমার হোলে তো।"

এর পর আর কথা চলে না। মুখ না চালিয়ে পা-ই চালাতে হয়। অবিক্রীত বাঁধানো টিকিটের খাতা বগলে, অম্লানবদনে বাড়ি ফিরে আসি।

শেষটায় আমিও যে টিকিট বেচার দলে ভিড়ে গেছি ক্রমে ক্রমে বন্ধুরা জেনে গেলো সবাই। তারপর থেকে বেচারাদের আর পাত্তাই পাওয়া যায় না। কোথায় যে তারা উধাও হোলো, কোন্ লোপাট-কায় গিয়ে গুম্ হয়ে বসে রইল কে জানে! আর আমার বাড়ি বয়েও আসে না, তাদের বাড়ি-বাড়ি গিয়েও ডেকে-হেঁকে সাড়া মেলে না আর; পথে-ঘাটে দৈবাৎ দেখা হয়ে গেলেও, দাঁড়ায় না একদণ্ড;

হ্যাঁ-না করতেই পা বাড়িয়ে বসে আছে ! হোলো কি সবার ? কারো আর টিকিটিও দেখা যায় না, টিকিটও না।

এমন কি বিনির বন্ধুরাও ক্রমশঃ বিরল হয়ে এলো। আমার টেবিলের উপর টিকিটের আধিপত্য দেখেই কিনা কে জানে !

আমিও হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি।

এক হপ্তাও কাটেনি, ছাপাখানার সৌজন্যে এচ্ আর কে আর-এর কৃপায়, এবং অবিশ্ববিশ্রুত রামখেলনের রামলীলার দৌলতে, ক'দিনের মধ্যেই আমার জীবনে যেন মিরাক্ল ঘটে গেলো !

এ ক'দিন প্রাণান্ত চেষ্টায়ও, একখানা টিকিটও বেচতে পারি নি, আনন্দেই আছি।

এ সপ্তাহে, বোধ হয় জীবনে এই প্রথম, পকেটটাও একটু যেন ভার ভার ঠেকছে—টাকাকড়ির বাড়াবাড়ি দেখা যাচ্ছে যৎকিঞ্চিৎ। অতএব শুক্রবার সারাটা দিন টো-টো করে ঘুরলাম—সিনেমায় সিনেমায়—তিনটার, ছটার, নয়টার শোয়ে পকেট হালকা করতে লাগলাম উঠে-পড়ে—

বারোটা বাজিয়ে বাড়ি ফিরলাম—সোজা নিজের বিছানায়।

পরের সুপ্রভাতে, শনিবার সকালে ঘুম ভেঙে টেবিলের দিকে তাকাতেই আমার চক্ষুস্থির !

বাঁধানো খাতাটা সেখানে নাই !

"অ্যাঁ ? ওখানে যে টিকিটগুলো ছিলো, গেলো কোথায়—?" তৎক্ষণাৎ হাঁক-ডাক লাগিয়ে দিই ঃ "কে নিলে ? বিনি ! বিনি। এই বিনি।"

চোটপাট লাগিয়ে দিই তৎক্ষণাৎ !

কেউ টেনেটুনে ফেলে দিলে না তো ! পাড়ার ছেলেপিলেদের কেউ ? কী হাঙ্গাম বলতো ! ওগুলো যে ওখানেই থাকবে—ঐ

টেবিলেই, মৌরসীপাট্টার মতো—মহাসমারোহে চিরদিন ধরেই বিরাজ করবে। ওরা গেছে কি আমিও গেছি! কী সর্বনাশ!

গর্বিত পদক্ষেপে বিনির অনুপ্রবেশ: "কী, হয়েছে কী? এত সকালে এমন চেঁচামেচি কেন?"

"আমার টিকিটগুলো দেখছি না যে। কে নিলে?"

"কে আবার নেবে? আমি—আমি বেচে দিয়েছি।"

"বেচে দিয়েছিস!" বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হয়।

"বাঃ, কাল সারাদিন ধরে তো ঐ করলাম কেবল।" বিনি বলে, চোখ-মুখ ঘুরিয়েই বলে: "সেল্ করলাম সবগুলো!"

"অ্যা? বলিস কি তুই?" বিছানার উপরেই বসে পড়ি।

"আজ শনিবার ওদের চ্যারিটি, অথচ দেখলাম, একখানাও তুমি বেচতে পারো নি। বুঝলাম ও তোমার কর্ম নয়। আমাকেই তাই বেরিয়ে পড়তে হোলো। চ্যারিটির কাজ তো সাফার করতে পারে না, সবগুলো সেল্ করে তবেই কাল বাড়ি ফিরেছি। কী করবো?"

"অ্যাঁ—বলিস কিরে?" আমি তাজ্জব হয়ে যাই। "সবগুলোই সেল্ করেছিস নাকি?"

"ও আর শক্ত কি এমন! আমাদের মেয়েদের কাছে ও তো কিছুই না—জলের মতোই সহজ! যার কাছে নিয়ে যাই, সেই কিনে ফ্যালে! হাসিমুখেই কেনে। অম্লানবদনেই কেনে! দশ টাকা দামের থাকলে তাও বেচে দিতাম। তাও খুঁজছিলো অনেকে!"

"কাদের কাছে বেচলি?" আমার বিস্ময় বাড়তেই থাকে আরো।

"বন্ধুদের দাদাদের থেকে শুরু করলাম। বাড়ি-বাড়ি সারা করে তারপর গেলাম কলেজে। প্রফেসারদের গছালাম কতক। ছেলেরাও কিনলে কিছু। তাদের দিয়ে-থুয়ে সোজা গেলাম কর্পোরেশনে—কাউন্সিলার, মেয়র, মেয়রেস—কাউকে বাদ দিইনি। তারপর কাগজ-

গুলোর অফিসে ঢুঁ মারলাম, বাদবাকী সব সেখানেই খতম ! এডিটর, সাব-এডিটর, প্রুফ-রীডার, কম্পোজিটার, প্রেসম্যান পর্যন্ত কাড়াকাড়ি করে কিনে ফেললে সকলে ! তিনশ' টিকিট কাটাতে আর কতক্ষণ?"

"তা বটে ! কতক্ষণ আর ।" দম নিয়ে বলি : "কিন্তু কিনলো তারা সব্বাই? একটুও কাঁচুমাচু না করে? একেবারে অম্লানবদনে ? মুখটুখ চুন না করে—টুঁ শব্দটি না করেই কিনলো ?"

"আদর্শ লক্ষ্মীছেলের মতো। ঠিক তুমি যেমন কিনে থাকো।" বিনির দুর্বিনীত জবাব : "কেন, কিনবে না কেন ? কী হয়েছে। তুমিই কেবল কিনতে জানো নাকি ?"

"না না, তা বলছি না, তবে কিনা—বাচ্চা রামখেলনের তবলায় রাজি হোলো মানুষ ? আপত্তি করলো না কেউ ?"

"কেউ কেউ বলেছিলো বটে, যে তবলার বদলে নাচের জলসা হলেই ভালো হোত, কিন্তু আমি বুঝিয়ে দিলুম, রামখেলনের জন্য নয়, এচ্ আর কে আর বেনিফিটের জন্যই চ্যারিটিটা হচ্ছে কিনা। অমনি তারা সবাই সমঝে গেলো ঠিক ।"

"ও ! এচ্ আর কে আর। তা বটে ।"

"ভালো কথা, এচ্ আর কে আর-টা কী দাদা ?"

"ও একটা জাপানী সিসটেম, পেটের ব্যায়রাম সারানোর। হারিকিরি। হারিকিরির নাম শুনেছিস তো ? সংক্ষেপে এচ্ আর কে আর ।"

"হা-রি-কি-রি। অদ্ভুত তো। তা তোমার ঐ ড্রয়ারের মধ্যে রয়েছে হারিকিরির সমস্ত টাকা—আটশোর কিছু কম, গোটা কয়েক ট্যাক্সি ভাড়ায় গেছে কিনা ।"

ড্রয়ার টেনে দেখলাম, রুমালে জড়ানো নোটে, টাকায়, আধুলিতে, সিকিতে গাদা।

"হারিকিরিওয়ালাদের টাকাটা দিয়ে এসো গে দাদা? আজই তো শনিবার—দেরি আর কই, ক'ঘণ্টা বা আছে? হ্যাঁ, জানো দাদা, একজন অফিসারকেও খানকতক টিকিট কিনিয়েছি। অফিসার হলো তো কী, গছিয়ে দিলাম, ছাড়বো কেন?"

"অফিসার! অফিসার আবার পেলি কোথায়?" এবার আমি বিস্ময়ের মগডালে উঠি।

"মেয়রের চেম্বারেই ছিলেন। যে-সে অফিসার নয়, জাঁদরেল একজন, কমিশনার সায়েব! পুলিস কমিশনার।" বিনির মুখে বিজয়িনীর হাসি।

"তাহলে—তাহলে—হারিকিরি ঠিকই হয়েছে—"

পরমুহূর্তেই, তৃণহীন অগাধ জলে তলিয়ে যেতে যেতে স্খলিতকণ্ঠে আমি বলি:

"তাহলে তো আর দেরি করা চলে না, বেরিয়ে পড়তে হয় এক্ষুনি। বাস্তবিক!"

শনিবার সকালেই যেন শনিবারের সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে—চারি-দিক অন্ধকার দেখি। কোথায় বা রামখেলন, কোথায় বা আমি আর বিলম্ব নয়; এখুনি কেটে পড়তে হবে এই শহর থেকে। এর ত্রিসীমানা থেকে—বিপ্লব বাধবার আগেই, সোরগোল না জাগতেই সটকে পড়তে হবে কোথাও। দিল্লী কিংবা ডিব্রুগড়, রাঁচী কিংবা করাচী, গৌহাটি কি গোঁদলপাড়া, কোথাও গিয়ে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকতে হবে—যেখানে পুলিসের গ্রেপ্তারী পরোয়ানার পরোয়া না থাকে!

হারিকিরির কিরি পর্যন্ত না এগুতে পারি, অন্তত: hurry আর না করলেই নয়!

বিনির হাসির বিনিময়ে আমি ঠিক হাসতে পারি না।